ভক্তিতত্ত্ব।

প্রথমভাগ।

ব্রহ্ম ভুতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাং॥

গীতা।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

চন্দননগর
অদ্বৈতমেসিন যন্ত্রে
শ্রীবিপিন বেহারী দে দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

ভক্তিতত্ত্ব।

উপক্রমণিকা।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতংনাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥
নবযোজন সাহস্রো বিস্তারস্য মহামুনে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গ মমবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্ ॥
(বিষ্ণুপুরাণ।)

ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ আর্য্য মহর্ষিগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে এই সাধন সিদ্ধ পূণ্যভূমি ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন স্থান মনুষ্যের কর্ম্মভূমি নহে। যে সকল মনুষ্য সৌভাগ্যক্রমে জন্ম মরণরূপ সংসার গতি অতিক্রম করতঃ মোক্ষপথের পথিক হইতে বাঞ্ছা করেন তাঁহা-দিগকে ভারতক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিতে হয় কারণ ভারতবর্ষই পারলৌ-কিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। যে উৎকৃষ্ট সাধনতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিধি ব্যবস্থা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা এ-খানে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একমাত্র ভারত সন্তানগণই ভাগ্যক্রমে ও সাধনবলে অনুভব করিতে সক্ষম। কিন্তু কালস্রোত অতি প্রবল! আজ দুর্জ্জয় কাল প্রভাবে ভারতের দেবদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব সকল ভারতবাসীর পক্ষে স্বপ্ন তুল্য হইয়াছে। এক্ষণে ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস পাঠ করিলে বোধ হয় যেন এ ভারত পূর্ব্বের সে ভারত নয়। নতুবা যে স্থানে ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব ছিল, নিস্কাম ধর্ম্মই জীবনের সার সঙ্কল্প ছিল, সত্যধর্ম্ম প্রাণস্বরূপছিল, শাস্ত্রাধ্যায়ণ একমাত্র কর্ম্ম ছিল, যেখানে প্রেম ভক্তির স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইত সেখানে আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে এ সকল নীরস ও অলীক বলিয়া প্রতীতি করায় কেন? এখন আর্য্যশাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা সকল সভ্যতার বিরোধি।

এখন ভারতের নূতন ব্যবস্থা উপস্থিত; নতুবা জড় জগতের জড় ব্যাপারের সঙ্কোচ করাই যে ভারতবাসীর মুলমন্ত্র ছিল এখন তাহার সম্যক বৃদ্ধি করাই প্রধান সঙ্কল্প হইবে কেন? পার্থিব উন্নতিতে অনাস্থাপূর্ব্বক পরমার্থিক উন্নতিতে মনোনিবেশ করাই যেখানকার বীজমন্ত্র ছিল সেখানে পার্থিব উন্নতিই সর্ব্বস্ব হইবে কেন? সম্পূর্ণ নিস্কাম হইয়া ধর্ম্মসাধন করাই যেখানকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেখানে আজ কামনার বৃদ্ধি করাই প্রধান সঙ্কল্প হইবে কেন? তাই বলি এখন কালপ্রভাবে ভারতে সকলি বিপরীত। যে ভারতে যাজ্ঞবল্ক, বাল্মীকি মনু ও বশিষ্ট প্রভৃতি ঋষিগণের ধর্ম্মশাস্ত্র জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, যে স্থানে মহামহোপাধ্যায় অশেষ জ্ঞান সাগর মহামুনি বেদব্যাস লক্ষ লক্ষ গভীর তত্বপূর্ণ শাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়া শাস্ত্র ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, যে ভারতে কালিদাস বররুচি মিহির প্রভৃতি শত শত মহাকবিদিগের জন্মস্থান, যে ভারতে দেবর্ষি নারদ ও মহাভাগবৎ শাণ্ডিল্য ঋষি ভক্তিসূত্র প্রচার করিয়া প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে পরম পুরুষার্থ স্বরূপ ভক্তিধনকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যে ভারতে একদিন সোণার গৌরাঙ্গের সুমধুর হরিধ্বনীতে ভক্তের হৃদয় কন্দর প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, আজ সেই ভারতেই স্থূলদর্শী কল্পিত পাণ্ডিত্যাভিমানী অভক্ত অরসজ্ঞ লোক সকল পূজ্য পদবী লাভ করিয়া সত্যধর্ম্ম লোপ করিতে বসিয়াছেন। হায়! এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত পূর্ব্বতন সভ্যতার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, এখন ধর্ম্মরূপী শশধরকে পাশ্চাত্য সভ্যতারূপী রাহু গ্রাস করিতেছে, এখন প্রেমভক্তি, ভাবাবেশ ও ধর্ম্মব্যাকুলতা বাতুলের কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে। আর্য্য ঋষিকুলোদ্ভব ভারতসন্তানগণ জড়বিজ্ঞানকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া, স্বার্থকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া এখন ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক করিবেন ইহার তুল্য আক্ষেপ আর কি হইতে পারে! যাহাহউক ভারতের পুরাতন কাহিনী লইয়া এখন আর বেশী আক্ষেপ করা অরণ্যে রোদনমাত্র। আপাততঃ মনকে প্রবোধ দিবার একটু কারণ দেখা যাইতেছে; বহুকাল পরে বোধ হয় ভারতে পুনরায় ধর্ম্মরূপ সুধাকরের নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ হইবার আশা হইয়াছে।

এখন দেশের চতুঃর্দ্দিকেই ধর্ম্ম লইয়া এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; অভিনয় ক্ষেত্রে, সংবাদপত্রে, প্রকাশ্য বক্তৃতায়, ধর্ম্মপ্রসঙ্গই সর্ব্বস্ব হইয়াছে। অবশ্য এ দৃশ্য অতীব আনন্দপ্রদ, কিন্তু প্রশ্ন এই যে এ ধর্ম্মের গতি উন্নতির দিকে কি অবনতির দিকে? প্রাচীন ঋষিগণ যে দৃষ্টি সাধনার দিকে রাখিতেন, বর্ত্তমান ভারতের সে দৃষ্টি এখন কোন দিকে এইটীই বিবেচ্য। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে বর্ত্তমান ধর্ম্ম ভারতের সে দৃষ্টি বহিঃর্ব্যাপারে ও বাক্যাড়ম্বরে পরিণত হইতেছে। এখনও যেন সভ্য ভারতের ধর্ম্মতৃষ্ণা জড়বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফলে শান্তি করিতে চাহে। যে বিশ্বাস ধর্ম্মের ভিত্তি ও যে ভক্তিরূপ অমূল্য ধন ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ তাহার যেন এখনও অস্তিত্ব নাই, কাজে-কাজেই প্রাণহীন দেহের যেরূপ অবস্থা, ভক্তিহীন ধর্ম্মের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইতেছে। নতুবা ধর্ম্ম ভারতের দৃষ্টিতে এখনও জড়তত্ত্বকে অমূল্য ও সার বলিয়া বোধ হইবে কেন। ঋষিদিগের ধর্ম্মপ্রণালী স্বতন্ত্র ছিল; তাঁহারা জড়কে ঘৃণা করিতেন কারণ তাঁহাদের জড়ের অতীত বস্তুতে লক্ষ ছিল, জড়ের মধ্য দিয়া তাঁহারা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ স্বরূপ চেতন পদার্থ দর্শন করিয়া জীবন সফল করিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্ব সকল সাধন দ্বারায় সম্যক আয়ত্ব না করিয়া কেবল শাস্ত্রীয় জ্ঞানে সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। সাধনই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল, সেই সাধন বলই তাঁহাদের স্বর্ব্বস্ব ছিল, বিশ্বাস তাহাদের নেতা ও ভক্তি-নিষ্ঠা তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় ছিল, কিন্তু এই সকল অমূল্য উপকরণ-গুলি বর্ত্তমান ভারতে এখন লুপ্তপ্রায়। যাহাহউক প্রাচীন ঋষিদিগের ও বর্ত্তমান সভ্য ভারতের ধর্ম্মভাব অনেক বিভিন্ন হইলেও ইহা ভারতের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে অতি আনন্দকর দৃশ্য। যেহেতু তাঁহারা সভ্য ভারতের ধর্ম্মভাবকে স্থায়ী করিবার মানসে গ্রন্থ প্রনয়ণ দ্বারায় হউক বা উপদেশ দ্বারায় হউক সকলের চিত্তকে সাধনের দিকে আকর্ষণ করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন।

ধর্ম্মের প্রাণ ভক্তি, সেই ভক্তি যতদিন মানব হৃদয়কে অধিকার না করে, ততদিন সাধন বিষয়ে অনুরাগ হইবার সম্ভাব নাই, কাজে কাজেই

ধর্ম্ম ভাবেরও স্ফূর্ত্তি পাইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। প্রত্যুত বারিহীন মীনের যেরূপ অবস্থা, ভক্তিশূন্য ধর্ম্মেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হয়। অতএব ইহাই সার সিদ্ধান্ত যে অত্যাবশ্যকীয় ও ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ এই অমূল্য ভক্তি বিষয়ক উপদেশ বর্ত্তমান ধর্ম্ম ভারতে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

এখন কথা এই যে সে উপদেশ কি উপায়ে লাভ হয়; আমরা জানি, যে সেই উপদেশ ঋষিদিগের প্রণীত শাস্ত্রে অভাব নাই এবং সেই সকল অমূল্য রত্ন রাজি স্বরূপ অনন্ত কোটী শাস্ত্র ভারতীয় শাস্ত্র ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ থাকাতে জ্ঞানভক্তি ও সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে আর কোন নূতন গ্রন্থের আবশ্যক নাই। তবে এক কথা এই যে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা অধিক হইয়াছে, তাহাতে ঐ সকল আর্য্য শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব রাশী ভাষানুবাদ ও সহজ ব্যখ্যা করিতে হয় কারণ তাহা ব্যতীত হৃদঙ্গম হইবার সম্ভাবনা অতি কম।

আজকাল যে সকল ধর্ম্ম গ্রন্থাদি প্রকাশ হইতেছে সেই সকল গ্রন্থ প্রকাশক মহোদয়দিগের ও বোধ হয় এই উদ্দেশ্য, পাণ্ডিত্যের অভিপ্রায়ে নহে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানির উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে আমিও অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপরোক্ত ইচ্ছাটীকে লক্ষ করিয়া বলিব— আর্য্য শাস্ত্র ইহার অবলম্বন, ভক্তি সূত্রকার মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যগণ ইহার নেতা, হিন্দুধর্ম্ম ইহার ভিত্তি।

আমরা বর্ত্তমান সমাজকে নবউদ্যমে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া শাস্ত্রীয় তত্বের সারসংগ্রহপূর্ব্বক এই ভক্তিতত্ত্বে সাধ্যমত ইহাই প্রমান করিতে চেষ্টা করিব যে ধর্ম্ম চিরদিন সাধন সাপেক্ষ্য, ভক্তি নিষ্টা সেই সাধনার প্রাণ স্বরূপ। ইহাতে ভক্তি মহিমা, ভক্তির স্বরূপ, ভক্তিভাব, ভক্তি প্রকরণ ভক্তি সাধনোপায়, ভক্তি যোগ, ভক্তি পথে বিঘ্ন ইত্যাদি ও বহুবিধ ভক্ত চরিতামৃত দ্বারায় ভক্তিতত্বটী যাহাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিব।

গ্রন্থকারস্য।

ভক্তিতত্ত্ব।

—— ০ ——

ভক্তির সূচনা।



ওঁ শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ।

(নারদসূত্র।)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় চিন্তা করিলে এবং ঈশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল অনুধাবন করিলে কেনা বলিবে যে মানব এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র জীব মাত্র! কিন্তু মানব অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া জগৎ স্রষ্টার সৃষ্টি কার্য্যের ছিদ্র অন্বেষণ করে এবং জঘন্য কামনায় অন্ধ হইয়া পরম শান্তি স্বরূপ সেই ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যদিও এই আপদ—সঙ্কুল ভয়ঙ্কর সংসার সাগরের আদ্যন্ত নির্ণয় করা দুসাধ্য, যদি ও ইহার প্রত্যেক তরঙ্গই জীবনান্তক স্বরূপ, তথাপি কেন যে মানব এক বিন্দু সুখের জন্য সেই উত্তাল তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দেয় তাহা জানি না। কত কাল ধরিয়া কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানব এই ভীষণ তরঙ্গাকুলিত দুর্জ্জ্যের অম্বুনিধিতে ভাসিতেছে, কত কাল পরে ইহার এ সংসারে গতি নিবৃত্তি হইবে তাহা কে বলিবে এ সকল নিগুঢ় তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়।

যে রূপ রাশি রাশি জল বুদ্বুদ সাগর গর্ভে প্রকাশিত হইয়া পুন তাহাতে বিলীন হয় সেই রূপ কত যে অসংখ্য মানবের আবির্ভাব ও তিরোভাব নিরন্তর হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে। আবার কোথা হইতে তাহারা আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কি জন্য আসিতেছে, কি জন্য

যাইতেছে তাহা ও জানা দুরূহ কেবল কতক দিবসের জন্য যে মানব সুখ দুঃখের ক্রীড়া পাত্র হইয়া সংসার সাগরে আসিয়া বেড়ায় তাহাই গণনীয়। অতএব এই অব্যক্ত আবির্ভাব ও তিরোভাব লইয়া যে আনন্দ ও নিরানন্দ প্রকাশ তাহা বাতুলের কার্য্য মাত্র! সেই জন্য গীতায় উক্ত হইয়াছে অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কাপরিবেদনা॥ অর্থাৎ মানব জন্মের পূর্ব্বে কি ছিল তাহা অপ্রকাশ্য আবার মৃত্যুর পরে কি হইবে তাহা ও অপ্রকাশ্য, কেবল মধ্যে কতকদিবসের জন্য প্রকাশিত, এ অবস্থায় জন্মমরণের জন্য সুখ দুঃখ প্রকাশ করাই ভ্রম মাত্র।

যখন সংসারের সকল গুঢ়তত্ত্বই এই রূপ দুর্জ্ঞেয় এবং মানবের জীবন কাল অতি অল্প ও কেবল দুঃখ পূর্ণ, যখন সংসারের অশান্তিই পরিণাম, যখন কাম্য জগতে কাম্য বস্তুর উপভোগে নিরন্তর কামনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে (ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে॥) তখন পাঠক! তুমি পুঞ্জ পুঞ্জ কামনা লইয়া এই দুঃখময় সংসারে আসিয়া শান্তি পাইবে কি সে, তোমার সুখের পিপাসা মিটিবে কি প্রকারে?

ঐ যে অনন্ত জলধি অনন্ত তরঙ্গমালায় পরিশোভিত হইয়া ভ্রুকুটি বিস্তার-করতঃ প্রশান্তগতিতে প্রবাহিত দেখিতেছ, ঐটীই সুখের পর দুঃখ, বিরামের পর পরিনাম আনাইয়া তোমার শান্তির পথের কণ্টক স্বরূপ। আহা! না জানি তোমার ন্যায় কত মানবকেই উহার উত্তাল তরঙ্গে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে; না জানি কত মানবকেই মায়া—মরিচিকা বৎ অসার আসার কুহকে প্রতারিত ও অশান্তিতে বিদগ্ধ হইয়া ঐ দুর্জ্ঞেয় সাগরগর্ভে বিলীন হইতে হইয়াছে, হায়! না জানি কত মানবই ঐ রত্নাকরের অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতে যাইয়া কতকগুলি উপল খণ্ড মাত্র লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছিল। কিন্তু ঐত সেই সকল অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যগুলি পতিত রহিয়াছে, তাঁহারা অশান্তি বিদগ্ধ চিত্তে ঐ সাগরগর্ভে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পাঠক! ঐ দুর্জ্জয় অনন্ত সাগরের ঘর্ণ আবর্ত্তে পতিত হইলে কাহারও নিস্তার নাই, আশ্চর্য্য ইহার প্রভাব! আশ্চর্য্য ইহার বিক্রম।

ঐ দেখ একজন দিগ্বিজয়ী বিজয় নিসান উড়াইয়া বীরদর্পে বীরেন্দ্র-কেশরীর ন্যায় মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সুন্দর পর্য্যাঙ্কে সুখে বিশ্রাম করিতেছেন। উনি উহাঁর পরিণামের বিষয় একবারও ভাবিবার অবকাশ পাইতেছেন না, কিন্তু ঐ দেখ উহাঁর পশ্চাতে একটি ভীষণ তরঙ্গ কোথা হইতে আসিয়া উহাঁর আসা, ভরসা নির্ম্মূল, করতঃ সুখের সংসার, আনন্দের নিকেতন, সকলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে! আবার ঐ দেখ একজন ধন কুবের ধনমদে উন্মত্তপ্রায় অতি সুরম্য হর্ম্মে অবস্থান ও দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন এবং সুন্দর দেবভোগ্যাহার করিয়া সুখের সাগরে ভাসিতেছেন, কিন্তু হায়! উহাঁর অদৃষ্টেও ভোগ স্থায়ী হইল কই? ঐ দেখ উত্তাল তরঙ্গে উহাঁকে কখন জলধি বক্ষে উত্থিত, আবার কখন অতলস্পর্শ বারিতে নিপাতিত করিতেছে; কখন উহাঁর মুখচন্দ্রিমা সুখের হাঁসিতে বিকসিত হইতেছে আবার তৎক্ষণাৎ অমাবস্যার কাল রজনী আসিয়া উহাঁকে মলিন করিতেছে। এখন বল দেখি পাঠক! উনি কি প্রকৃত সুখী না দুঃখী? যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখ তবে বুঝিতে পারিবে যে উনি ভয়ানক অশান্তিতে কাল হরণ করিতেছেন। অতএব যখন সংসারের এই রীতি, প্রকৃতিরাজের এই ধর্ম্ম, কাম্য জগতের এই রূপই পুরস্কার, তখন পাঠক! তোমার সুখের আসা মিটিবে কিসে? শান্তি লাভ হইবে কি প্রকারে? তুমি শান্তি সুখের জন্য যে সংসারে নির্ভর করিয়াছে অশান্তিই তাহার পরিণাম জানিবে।

ঐ দেখ সুখের পর দুঃখ, হাঁসির পর কান্না সম্পদের পর বিপদ, আসার পর নৈরাশ্য নিরন্তর ঘুরিতেছে। ঐ দেখ জন্মের পর মৃত্যু বিরামের পর নিগ্রহ বিবর্ত্তের পর পরিবর্ত্তন, উন্মজ্জনের পর নিমজ্জন ক্রমান্বয় হইতেছে। অতএব এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে তোমার শান্তির আসা কই। কত লোক কতকাল ধরিয়া একটু শান্তি সুখের জন্য ঘুরিতেছে, কত প্রকার অভিনয় করিতেছে, কত লোককে কতবার মিছামিছি ভুলাইতেছে, কাঁদাইতেছে হাঁসাইতেছে তবুত সুখের পিপাসা মিটিতেছে না, হাঁসি কান্নার গোল ঘুচিতেছে না, তাই বলি পাঠক! তোমার সুখের পিপাসা মিটিবে কিসে, শান্তি সম্ভোগ হইবে কি প্রকারে?

পাঠক! যদি এই কামনাপূর্ণ জগতে এবং অশান্তিময় সংসারে প্রকৃত শান্তি সুখ লাভ করিতে চাহ, যদি এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে স্থায়ী আনন্দ অনুভব করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে জীবের কল্যাণের জন্য পরমপ্রেমিক সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা দেবর্ষি নারদ কি বলিতেছেন শ্রবণ কর—ওঁ শান্তিরূপাৎ পরমানন্দ রূপাচ্চ, অর্থাৎ ভক্তিই শান্তি ও পরমানন্দ স্বরূপ। পাঠক! আবার ঐ দেখ ভগবান শাণ্ডিল্য বলিতেছেন "তর্ম্মংস্থ স্যামৃতত্ত্বোপদেশাৎ অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং অমৃত স্বরূপ সেইজন্য তাঁহার ভক্তিও অমৃত ময়ী। এই অমৃতস্বরূপ ভক্তি লাভ হইলে জীব অমর হয়। অতএব পাঠক! এই অমৃত স্বরূপ ভক্তির সাধন তোমার সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক হইয়াছে। যদি এই ভক্তির স্বরূপ ও সাধন সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে একজন বিনীত শিষ্যকে একজন পরমপ্রেমিক গুরু যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।



ভক্তি মাহাত্ম্য।



ওঁ সাতু কর্ম্মজ্ঞান যোগেভ্যোপ্যধিকতরা।

শিষ্য। হে গুরো! এই সংসারে আমার আর ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে ইচ্ছা নাই। যে অর্থের কামনায়, যে সুখের লালসায় আমি এতদিন এ সংসারে ঘুরিলাম সে অর্থও পাইলাম না, সুখের তৃষ্ণাও শান্তি হইল না, কেবল নিরন্তর অশান্তি বিদগ্ধ হৃদয়ে কাল হরণ করিতেছি। অতএব প্রভো! কি প্রকারে আমার শান্তি লাভ হইবে কি প্রকারে ভগবৎতত্ত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব, কোন মার্গ অবলম্বন করিলে ভগবানের কৃপালাভ সহজে করিতে পারিব তাহা আমাকে উপদেশ দেন।

গুরু। বৎস! তোমার প্রশ্নগুলি শুনিলেই বোধ হয় তোমার একটু বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু এ বৈরাগ্য নীরস, সরস ভক্তি বৈরাগ্য না হইলে শান্তি নাই। বৎস! সরস ও নীরস বৈরাগ্যের পার্থক্য আমি তোমাকে পরে উপদেশ দিব এখন কিরূপে শান্তিলাভ হয় এবং কি উপায়ে ভগবানকে সহজে সুপ্রসন্ন করিতে পারা যায় তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। ভক্তি আচার্য্যগণ বলেন যে, ভক্তিই একমাত্র শান্তি স্বরূপা এবং ইহাই কেবল ভগবানের কৃপালাভ ও তাঁহাকে সুপ্রসন্ন করিবার সহজ ও সরস উপায়।

শিষ্য। প্রভো! যদি ভক্তির এতই মহিমা হয় তাহা হইলে আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেন।

গুরু। বৎস! তোমার এ সাধু প্রশ্নে আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। আহা! ভক্তিতত্ত্ব কীর্ত্তন অথবা শ্রবণ করিলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই ভবরোগের শান্তি হয়, কারণ ইহাতে ভক্ত বৎসল ভগবান সুপ্রসন্ন হয়েন। বৎস! ভক্তি এই কথা জিহ্বায় উচ্চারণ করিবামাত্র যেন মন প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। ইহাতে যেন কি এক বৈদ্যুতিক শক্তি আছে সেইজন্য সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। আহা! চতুরশীত লক্ষযোজন পথ

ভ্রমণে ক্লান্ত ও ত্রিতাপানলে বিদগ্ধ মানব যদি এই ভক্তির সুশীতল ছায়া প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সর্ব্বদুঃখ দূর হয়। ভক্তির অপার মহিমা ও ইহার আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি দেখা যায়। বৎস! ইহার যদি অমোঘ আকর্ষণ না থাকিত তাহাহইলে কি অসঙ্গমস্পর্শ মব্যক্ত চিন্ময় ঈশ্বর, যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে ব্যাপিয়া আছেন, যিনি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রতি অনুপরমাণুতে পূর্ণ রূপে রহিয়াছেন, যিনি নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তিনি সাকার হইয়া যুগে যুগে ভূভার হরনার্থ মর্ত্তে অবতীর্ণ হইতেন? ভক্তির আকর্ষণ শক্তি আছে বলিয়াইত পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব ভবদুঃখভঞ্জন, ভক্তের হৃদয়নিধি ভগবানকে ভক্তিতে আকর্ষণকরিয়াছিলেন; ভক্তির আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে বলিয়াইত পাণ্ডব পত্নী দ্রৌপদী কুরুসভায় অগণ্যরাজন্যবর্গের সম্মুখে বৈকুণ্ঠনাথ ভূভারহারী হরিকে আকর্ষণ করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন; ভক্তির অপার মহিমা আছে বলিয়াইত মাঅন্নদা কাশিধাম পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত রামপ্রসাদের পর্ণ কুটীরে সঙ্গীত শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। আহা! ভক্তির যদি অমোঘ আকর্ষণ না থাকিত তাহা হইলে কি আদ্যাশক্তি মাতঃ বিশ্বজননি কৈলাশের মনি মন্দির অন্ধকার করিয়া প্রতি বৎসর দীন দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে উপস্থিত হইতেন? যদি ভক্তির প্রাধান্য না থাকিত তাহা হইলে কি আর ভক্ত অম্বরীষ দুর্ব্বাসার কোপে নিস্তার পাইতেন? কেবল ভক্তিরগুণেই বশীভূত হইয়া ভগবান চিরদিনের জন্য ভক্তের অধীন হইয়াছেন, তাঁহার নিজের স্বাধীনতা নাই সেই জন্য ভক্তদ্রোহীকে তিনি নিজে রক্ষা করিতে পারেন না। ভগবান বলেন—অহং ভক্ত পরাধিনোহস্বতন্ত্রইবদ্বীজ, সাধুভিগ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্ত জন প্রিয়ঃ। অর্থাৎ আমি অস্বতন্ত্ররূপে ভক্তের পরাধীন কারণ আমার প্রিয় সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয়কে চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়াছেন। দুর্ব্বাসা সেই জন্য সুদর্শনচক্রের ভয়ে ব্রহ্মলোক, সুরলোক ও গোলক ভ্রমণ করিলেও ভগবান তাঁহাকে আশ্রয় দিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে সেই দুর্ব্বাসা ভক্ত অম্বরীষের নিকট আসিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। আহা! আশ্চর্য্য ভক্তি মহিমা, আশ্চর্য্য ভগবানের ভক্তবৎসলতা। বৎস! ভক্তি মহিমার অন্ত

নাই। অধিক কি যিনি নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ অরূপী অবাঙ্মনসগোচর, তিনি ভক্তি গুণে বশীভূত হইয়া ভবভয়ভীত ভক্তের প্রাণসখা ও প্রিয়তম স্বামী হয়েন। আহা! এই ভক্তিধনেই বশীভূত হইয়া ত ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু বিপদ ভঞ্জন হরি, বনবাসী পাণ্ডবদিগকে বনমধ্যে দুর্ব্বাসার মহাকোপে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ভক্তির গুণেই দীনদরিদ্র বিদুর ভগবানকে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং এই ভক্তি গুণেই চণ্ডালিনী শবরী অতি নীচ জাতি হইয়াও উচ্চ পদবী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছিলেন। এই ভক্তি গুণেই সজন কসাই হইয়াও, রুইদাস চর্ম্মকার হইয়াও, হরিদাস যবন হইয়াও, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন। আহা! ধন্য ভক্তির প্রভাব ধন্য ইহার শক্তি!

বৎস! আচার্য্যগণ ও ঋষিগণ সমস্বরে শাস্ত্রে এই ভক্তির "যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহা এত সূক্ষ্ম, এত গভীর, এত সারগর্ভ, যে দুই একটী কথায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। বৎস! ভক্তি শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত জানিবে যে—ভবরোগাক্রান্ত ভ্রান্ত পথিকের ভক্তিই একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ। ইহার সুবিমল প্রতিবিম্ব একবার মাত্র হৃদয় মধ্যে প্রতিভাত হইলে হৃদয়স্থ অপার সংসার বাসনা ও সুখ দুঃখের স্বপ্ন ও মলিন অপবিত্র বিষয় বাসনা সকল এক কালিন বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার সঙ্গ ক্ষণমাত্র লাভ হইলে সুখ পূর্ণ স্বর্গভোগ ও যোগৈশ্বর্য্য পূর্ণ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া বোধ হয়। ভক্তির গুণে ব্রহ্মাদি সুরগণের আরাধ্য স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গ্রীষ্মাতিশয্যে মন প্রাণ আকুল হইলে একটু শীতল বায়ুস্পর্শে যেরূপ সুখ লাভ হয়, প্রাণ জুড়াইয়া যায়, ঘোর অনাবৃষ্টির পর বারিবর্ষণ হইলে যেরূপ আনন্দের উদ্রেক হয়, সেইরূপ সংসারের বিষম বিষে সন্তপ্ত, স্বার্থের গুরুভারে ভারাক্রান্ত ও জনন মরণ রূপ সংসার গতিতে ক্লিষ্ট মানব যদি এই দেব দুর্ল্লভ ভক্তিধন লাভ করে তাহা হইলে অমৃতসাগরে ডুবিয়া চরিতার্থ হয় এবং জীবন সফল করে। ইহা পরম শান্তি ও পরমানন্দ স্বরূপ (ওঁ আনন্দরূপাচ্চ)। যোগীগণ নিরন্তর সমাধি অবলম্বন করিয়াও এই দুর্ল্লভ ধনের অভাবে ভগবান শ্রীহরিকে সম্যক

রূপে সুপ্রসন্ন করিতে পারেন না কিন্তু ইহা একবার মাত্র হৃদয় স্পর্শ করিলে জগৎ সুধাময় বোধ হয় সাধন ভজন সরস হয় ও ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়। ইহা ঘোর অন্ধকারের ধ্রুবতারা স্বরূপ এবং উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল সংসার সাগরের একমাত্র শান্তিস্বরূপ। ভক্তিতেই বশীভূত হইয়া শ্রীহরি বলিরাজের দ্বারের প্রহরী এবং ইহাতেই আবদ্ধ হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের কখন দূত কার্য্য কখন সারথ্য করিয়াছেন। এই সর্ব্বসুখের খণি পরশমণি স্বরূপ ভক্তিধনে বশীভূত হইয়া ভগবান "ভক্তের বোঝা বহন করেন।" বৎস! এই পরম সম্পত্তির গৌরবার্থে শ্রীহরি বলিয়াছেন " নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে নচ, মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ " অর্থাৎ আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না এবং যোগীদিগের হৃদয়েও বাস করি না, আমার ভক্ত যেখানে আমাকে কীর্ত্তন করেন আমি সেইখানেই থাকি। এই ভক্তির গৌরবার্থে কপিলদেব বলিয়াছেন " ন যজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যাখিলাত্মনি, সদৃশোঽস্তি শিবঃপন্থা যোগীনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে " অর্থাৎ যোগীদিগের ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত অখিলাত্মা ভগবানে ভক্তিযোগ ব্যতীত শুভদায়ক পথ দ্বিতীয় আর নাই। এই ভক্তির আবেশে বিহ্বল হইয়া দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন " ওঁ যংলব্ধা পুমান্‌সিদ্ধো ভবত্যামৃতি র্ভবতি, তৃপ্তি র্ভবতি, ওঁ যত প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি, ন শোচতি, ন দ্বেষ্টি, নরমতে, নোৎসাহী ভবতি, ওঁ যদ্‌জ্ঞানাম্মত্তো ভবতি, স্তব্ধোভবত্যাত্মারামো ভবতি। অর্থাৎ যাহা লাভ হইলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃত হয়, তৃপ্ত হয়, যাহা পাইলে মনুষ্যের তৃষ্ণা শোক দূর হয়, যাহা বিদিত হইলে মনুষ্য উন্মত্ত ও স্তব্ধ এবং আত্মারাম হয় তাহাই ভক্তি। আহা! কপিলদেব এই ভক্তির গৌরবার্থে বলিয়াছেন— সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনামৎসেবনং জনাঃ॥ অর্থাৎ সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় ভক্তকে দিলেও তিনি ভগবানের সেবাকার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না। এই ভক্তি সম্বন্ধে ঋষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন 'তন্মংসন্নস্যা মৃতত্বোপদেশাৎ' অর্থাৎ ভক্তিতে মন সংলগ্ন হইলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে এই অমৃতপ্রদ ভক্তির গৌরবার্থে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—" অপিচেৎ সুদুরা-

চাপ্যসৌ ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহিসঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মাশশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতিঃ।” অর্থাৎ হে কৌন্তেয়। আমাকে যে অনন্যচিত্তে ভক্তি-পূর্ব্বক আরাধনা করে, সে অতিশয় দুরাচার হইলেও তাহাকে সাধুবলিয়া জানিবে যেহেতু সে ব্যক্তি প্রকৃত বস্তুতে মনোনিবেশ করিয়াছে। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি সদাচার বা দুরাচার যেমনই কেন হউক না তাহার বিনাশ নাই, সে অবশ্যই কল্যাণ লাভ করিবে তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। এই অমূল্য ধনের অপার মহিমা বিস্তারপূর্ব্বক শাস্ত্রকারগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্নদৃশ্যতে। ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥ অর্থাৎ যে শাস্ত্রে হরি-ভক্তির বিষয় কীর্ত্তিত না হইয়াছে তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেও শ্রবণীয় ও কথনীয় নহে।

বৎস! আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্ত এই অমূল্য ধনের জন্য লালায়িত; সেই জন্য মহামুনি বেদব্যাস সারসিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়া-ছেন—“আত্মারামশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকিং ভক্তি মিথ্যাভূতগুণোহরিঃ॥ অর্থাৎ আত্মারাম মুক্তপুরুষগণ যাঁহাদের সংসারগ্রন্থি ও মায়া বন্ধন একবারে ছিন্ন হইয়াছে তাহারাও ভগবানে অহৈতুকি ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তির অপার গুণ ও মহিমা আছে বলিয়াই পরমভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—“যোনী যোনী সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষুতেষ্বচলাভক্তিরচ্যুতাস্ত সদাত্বয়ীতি॥” অর্থাৎ হে নাথ! আমি যে যে যোনীতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন যেন সেই সেই জন্মেতে তোমার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে। অতএব বৎস! দেখ ভক্তি কতদূর অমূল্য ধন।

বৎস! এই ভক্তির গুণে পক্ষপাত শূন্য ভগবানকে ভক্তের পক্ষ অবলম্বন করিতে হয় সেই জন্য ভগবান নিজেই গীতায় বলিয়াছেন “সমোহহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোহস্তিনপ্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তুমাং ভক্ত্যাময়িতে তেষু চাপ্যহং॥” অর্থাৎ সমস্ত ভূতেতে আমি সমদর্শী

হইলেও ভক্তির এমনি প্রভাব যে আমাকে পক্ষপাত করিয়া ফেলে। বৎস! গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সার ইহার দ্বাদশাধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ভক্তি প্রশংসা করিয়া ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্ত যখন এই ভক্তির জন্য লালায়িত এবং মায়া ত্যাগী শুক নারদ পর্য্যন্ত যখন এই ভক্তির জন্য ব্যাকুল তখন ইহার কত মূল্য বুঝিয়া দেখ। এই অমূল্য ভক্তি ব্রহ্মাদি সুরগণের আরাধ্য ধন এবং ইহাতেই বশীভূত হইয়া নির্ব্বিকায় নিরঞ্জন ব্রহ্ম, যাঁহার ইচ্ছা-মাত্র জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে; যিনি বুদ্ধিমনের অগোচর, বেদ বেদান্তে যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছে—"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ আনন্দং ব্রহ্মনোবিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন;" যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, যিনি "অবাঙমানসগোচর" যিনি মহান হইতেও মহান, তিনি সাকার ও স্বগুণ হয়েন, বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হয়েন এবং সাধারণ লোকের ন্যায় ভক্তের সহিত ক্রীড়া করেন। বৎস! ভক্তি না থাকিলে সেই অরূপী কূটস্থ অচল ধ্রুব সত্য সনাতন পুরুষকে কেহই সহজে জানিতে পারিত না।

ভগবান ভক্তবৎসল সেইজন্য তাঁহার ভক্তের এত সমাদর। বৎস! যদি ভগবান ভৃগুমুনির পদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ না করিতেন এবং পঞ্চপাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের পদধৌত না করিতেন তাহা হইলে কেহই তাহাদিগের সমাদর করিত না। যদি তিনি দীন দুঃখীর সম্মান রক্ষা না করিতেন, বিনীত ভক্তের ভার গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে কেহই তাঁহাকে 'দীনবন্ধু' "কাঙ্গালের ঠাকুর" "ভক্তবৎসল" বলিত না।

শিষ্য। প্রভো! অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভক্তি কেবল নীচাধিকারীদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির জন্য অর্থাৎ যাহাদিগের যোগ বল ও বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য নাই যাহারা ধ্যান ধারণায় মনোনিবেশ করিতে পারে না নিতান্ত অজ্ঞান তাহারাই ভক্তিসাধন দ্বারায় ভগবানকে অর্চ্চনা করে এ কথা কি তবে সত্য নহে?

গুরু। বৎস! তোমার কথা সম্পূর্ণ অলীক ও অগ্রাহ্য। এ কথা যাহারা বলে তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। যদি ভক্তি কেবল নীচাধি-

কারীদিগের জন্য হইত তাহা হইলে গীতার এ কথা কখনই থাকিত না—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষুভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতেপরাং॥" অর্থাৎ ব্রহ্মভাব সম্পন্ন নির্ম্মল শান্ত পরমানন্দ পূর্ণ হইয়া শোক কামাদি বিহীন ও সর্ব্বজীবে সমভাব হইলে তবে পরাভক্তি লাভ হয়। যদি ভক্তি কেবল নীচাধীকারীগণের সাধনীয় হইত তাহা হইলে সর্ব্বতত্ত্বদর্শী পরম জ্ঞানী ও পরম প্রেমিক দেবর্ষী নারদ কখনই বলিতেন না "ওঁ তস্মাস্তেব গ্রাহ্য মুমুক্ষুভিঃ অর্থাৎ মুমুক্ষুগণ পর্য্যন্ত দুর্লভ ভক্তিধনকে সাধন করুণ। যদি ভক্তি নীচাধিকারীদিগের জন্য হইত তাহা হইলে মায়াত্যাগী পরম জ্ঞানী শুকদেব গোস্বামী প্রত্যহ ভক্তিসহকারে ভাগবত শাস্ত্র পাঠ করিতেন না, এবং দেবর্ষী নারদও সর্ব্বক্ষণ ভক্তিতে গদ গদ হইয়া হরিগুণ গান করিতেন না। বৎস! যাঁহারা ভক্তিকে নীচাধিকারীর সাধনীয় বলিয়া জানিয়াছেন তাহারা ভক্তি মহিমা কিছুই অবগত নহেন এবং তাঁহাদের শাস্ত্র পাঠও বিড়ম্বনা মাত্র। ভক্তি কখনই নীচাধিকারীদিগের সাধনীয় নহে বরং ইহা ব্রহ্মাদি সুরগণের আরাধ্য ধন জানিবে। বৎস! ভক্তির মহিমা অধিক আর কি বলিব ইহাতেই আবদ্ধ হইয়া নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মকে সাকার ও স্বগুণ হইতে হইয়াছে এবং ইহাতেই বশীভূত হইয়া ভগবানকে বেদ পারজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সামান্য চণ্ডালের সমাদর করিতে হয়।

শিষ্য। প্রভো! আপনার কথায় আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, যিনি বুদ্ধিমানের অগোচর, বেদবেদান্তে যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছে—"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন" যিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, যিনি "অবাঙ্মানসগোচর" মহান হইতেও মহান, যাঁহাকে জ্ঞান ভিন্ন জানা যায় না, তাঁহাকে সামান্য চণ্ডাল কিরূপে জানিবে, এবং ভগবান বা কিরূপে সেই সামান্য চণ্ডালের সমাদর করেন, আপনার কথা আমার বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না।

গুরু—বৎস! তুমি শাস্ত্রীয় তত্ত্ব কিছুই অবগত নহ, সেই জন্য আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ। যে শাস্ত্রে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন

"অবাঙমানসগোচর" বলিয়াছে, তাহাতেই আবার উঁহাকে "ভক্তবৎসল" "ভক্তাধীন" ও "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে, অতএব বৎস! ভগবানের এইটীই লীলারহস্য যে, তিনি ভক্তের ভক্তিতে আবদ্ধ হয়েন এবং ভক্তের জন্য স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্তে অবতীর্ণ হয়েন। প্রকৃত কথা ভগবানের সৃষ্টি ক্রিয়াদি যখন লীলারহস্য ভিন্ন আর কিছুই নহে তখন ইহাই তাঁহার প্রধান লীলা জানিবে যে তিনি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন হইয়াও সাকার হয়েন এবং সামান্য দীন দুঃখী পথের ভিখারী ভক্তের অধীন হয়েন। শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত যে বহুকাল পর্য্যন্ত যোগ যাগ জ্ঞানাদি সাধন করিলে যাহা না হয় ভক্তিতে তাহা অতি সহজে হয়। শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ আছে যে যোগী কর্ম্মী জ্ঞানী অপেক্ষা ভক্তই শ্রেষ্ঠ।

বৎস! প্রথমতঃ বহুতর জ্ঞান ও যোগশাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমার হৃদয় অতিশয় নীরস ও নিরানন্দ হইয়াছিল কিন্তু ভগবৎ কৃপায় ভক্তিগ্রন্থ আলোচনা করিয়া এখন বিমল সুখ লাভ এবং নিত্য নূতন আনন্দ আস্বাদন করিতেছি। আমার এখন ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে যে ভক্তিমার্গই সহজ ও সুখকর পথ এবং ইহাই ভববন্ধন মোচন হইবার অমোঘ অস্ত্র স্বরূপ এবং ভগবৎ কৃপা লাভ করিবার একমাত্র সহজ উপায়।

শিষ্য—প্রভো! যে ভক্তির বিষয়ে আপনি এত প্রশংসা করিতেছেন ইহাকে জ্ঞানিগণ মায়িক ও কল্পনামূলক বলিয়া থাকেন যদি ভক্তি কল্পনামূলক হয় তাহা হইলে ইহার প্রাধান্য কোথায়?

গুরু—বৎস! যাঁহারা ভক্তিকে মায়িক বা কল্পনামূলক বলেন তাঁহারা শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ভক্তিশাস্ত্রের এই মীমাংসা যে, ভক্তিদ্বারায় মায়ার অতীত ধন লাভ করাযায় এবং ইহাতেই প্রকৃতরূপে মায়াতীত হওয়া যায়, কারণ ভগবানে আশক্তি হইলে মায়ার লেশ মাত্র থাকে না সেই জন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব য প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে"।

বৎস! ভক্তির আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহা নীরস বিষয়কে সরস করে, নির্জীব পদার্থকে সজীব করে, এবং দূরস্থ অপরিচিত পদার্থকে নিকটস্থ ও পরিচিত করে। জানি না ইহাতে কি এক আকর্ষণী শক্তি কি এক অনির্ব্বচনীয় মাধুরী আছে, যে মুহূর্ত্তেকে ইহা হৃদয়কে অধিকার করে সেই মুহূর্ত্তেকে, গ্রন্থপাঠ বা সদালাপ প্রভৃতি যাহাই করা যায় তাহা যেন সুধামাখা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অভক্তিতে সেই সকল অনুষ্ঠান করিলে বিরক্তি বোধ হয়। বৎস! সচরাচর ইহাও দেখা যায় যে কেহ ভক্তি অনুরাগের সহিত কোন কথা বলিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায় কিন্তু অভক্তিতে স্বভাবত বিরক্তি বোধ হয়। আমি যে তোমাকে ভক্তিকে সর্ব্ব সাধনার সার ও একমাত্র প্রয়োজনীয় বলিলাম তাহা ভক্তি শাস্ত্রের মীমাংসা। নারদের—ওঁ তস্মাৎসৈব গ্রাহ্য মুমুক্ষুভিঃ এই সূত্রই ইহার প্রমাণ। বৎস! তুমি এখন সকল সন্দেহ ছাড়িয়া এই দুর্লভ ভক্তিধনকে আশ্রয় কর তাহা হইলে তোমার সর্ব্ব দুঃখ দূর হইবে, সর্ব্বসাধনা সফল হইবে এবং ভক্তবৎসল হরিকে সহজে লাভ করিতে পারিবে।

ভক্তিই প্রয়োজন।

ওঁ তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্।

শিষ্য। প্রভো! আপনার মুখে ভক্তিমহিমা শুনিয়া আমার অপার আনন্দ লাভ হইল কিন্তু আপনি বলিলেন যে যোগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা ভক্তই শ্রেষ্ঠ এ কথা আমার এখনও সম্পূর্ণ ধারণা হইতেছে না কারণ শাস্ত্রে প্রত্যেক গুলিরই প্রাধান্য দেখা যায়, অতএব আপনি যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ফলাফল আমাকে পৃথক পৃথক করিয়া বলুন।

গুরু। বৎস! এ গুলিকে পৃথক পৃথক করিয়া পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে হইলে বিচার ও যুক্তিসহ রাশি রাশি শাস্ত্রালোচনার আবশ্যক হয়, আবার বিচার যুক্তি করিতে হইলেই তর্ক বিতর্ক আসিয়া পড়ে কিন্তু তর্ক বিতর্ক ভক্তির নিতান্ত বিরোধী এজন্য সংক্ষেপতঃ এ গুলির সারার্থ ও স্থূল মর্ম্ম কিছু কিছু বলিতেছি স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর।

বৎস! ভগবানকে জানিবার জন্য ও তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবার জন্য কালে কালে মহাপুরুষগণও সিদ্ধ যোগী ঋষিগণ নানাপ্রকার উপায় প্রকাশ করিয়াছেন। যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি ইত্যাদি প্রত্যেকগুলিরই উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ করান। কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটি সুখকর, সুগম, কোনটি দুষ্কর কষ্টসাধ্য, ও কোনটি কালভেদে পাত্রভেদে এবং অবস্থাভেদে অসাধ্য সাধন ইহাই বিচার করা আবশ্যক। অতএব নিম্নে এ গুলির বিষয় পৃথক পৃথক করিয়া বলিতেছি।

বৎস! বেদকে ঋষিগণ কল্প বৃক্ষ বলেন তাহার কারণ এই যে, ইহা হইতে যে যাহা প্রার্থনা করে সে সেইরূপ ফল লাভ করে। • এই বেদ হইতেই ঋষি, ছন্দ, মন্ত্র, দেবতা সকল উদ্ধারপূর্ব্বক বিশিষ্ট বিশিষ্ট গোত্র ও শাখা প্রচলিত করতঃ ভারতীয় সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করা হইয়াছে। মহর্ষিগণ এই অনাদি কল্প বৃক্ষ হইতে ইচ্ছামত পুষ্প চয়ন করিয়া লোকের হিতার্থে যে অপূর্ব্ব বৈজয়ন্তি মালা স্বরূপ

মীমাংসাদি রচনা করিয়াছেন তাহা যোগীদিগের "যোগমীমাংসা" কর্ম্মীদিগের "কর্ম্ম মীমাংসা" জ্ঞানীদিগের "উত্তর বা ব্রহ্ম মীমাংসা" এবং ভক্তদিগের "ভক্তি মীমাংসা" এই সকল মীমাংসাদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি দ্বারা দেশ কাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন মতে প্রণীত হইয়াছে এবং এই সকল শাস্ত্রই ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মকে অটল রাখিয়াছে। এই সকল মীমাংসাদির মধ্য জৈমিনীকৃত পূর্ব্ব মীমাংসাই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস তাহার পর "উত্তর মীমাংসা" রচনা করেন এই দুই মীমাংসাই সমীচিন। পতঞ্জলি, গোরক্ষ "যাজ্ঞবল্ক" ও কপিল প্রভৃতি ঋষিগণ যোগশাস্ত্রের প্রণেতা এবং শাণ্ডিল্য নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ ভক্তিসূত্র রচনা করিয়াছেন ইহাদের সকলেরই অবলম্বন বেদ।

বৎস! পতঞ্জলি প্রভৃতি যোগশাস্ত্র প্রণেতাগণ বলেন যে, মনের বৃত্তি সমূহ রুদ্ধ করাই প্রধান যোগ (যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ) কারণ মনের স্বাভাবিক গতিই বহিঃমুর্খ, ইহাকে ভগবতাভিমুখ করিতে হইলে সাধন আবশ্যক হয়, সেই সাধনই মনবৃত্তিনিরোধরূপ প্রধান যোগ। পতঞ্জলি বলেন যোগ প্রধানত চার প্রকার—মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ এবং হটযোগ, এই চতুঃপ্রকার যোগ সাধন করিলে মানব ধীর প্রকৃতি দীর্ঘজীবী, সুস্থকায় ও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে। যোগীদিগের প্রধান যুক্তি এই যে মন ইন্দ্রিয় দ্বারায় বিক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই বিষয়ে ধাবিত হইতেছে এবং তদ্বারা মনের যে স্বাভাবিক অসামান্য অদ্ভুত তেজোরাশি আছে তাহা হ্রাস হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যদি মনকে নিরোধ করত অর্থাৎ কৌশলে সাধন দ্বারায় পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই দিগ্‌দিকন্ত প্রসারিণী চিত্ত একাগ্র হইয়া অতি দুরারাধ্য দুর্জ্ঞেয় ও অনির্দ্দিশ্য বস্তুর তত্ত্ব অনায়াসে জানিতে পারে। এই সত্যের প্রমাণে যোগীগণ অর্ককান্ত মণি অথবা আতস পাথরের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন। আতস পাথর যেরূপ সূর্য্যকিরণে ধরিলে কিরণরাশি একস্থানে পুঞ্জীকৃত হইয়া শুষ্ক তৃণাদি দগ্ধ করিতে পারে, সেইরূপ বিক্ষিপ্ত মনকে সাধন দ্বারায় কৌশলে একাগ্র করিতে পারিলে

অসাধ্য সাধনে ক্ষমতা জন্মে, অর্থাৎ যেরূপ সহস্রমুখী সূর্য্যকিরণরাশিকে অর্ককান্ত মণিদ্বারায় কেন্দ্রীকৃত করিতে পারিলে সূর্য্যকিরণ অধিকতর তেজসম্পন্ন হইয়া সমুদায় দাহ্য বস্তু বিদগ্ধ করে এবং অধিকতর আলোক হইয়া অণু পরমাণু পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় সেইরূপ বিক্ষিপ্ত মনকে কৌশলে একস্থানে পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত করিতে পারিলে অর্থাৎ অন্য সকল ইন্দ্রিয় মুখ নিরোধ করত একটিমাত্র মুখ প্রকাশ রাখিতে পারিলে মনের তেজোরাশি ও ধারণাশক্তি অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয় এবং তদ্বারায় অতি দুর্জ্ঞেয় বিষয় জানা যায় ও সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। বস্তুতঃ যে কোন একটি সহস্রমুখী বস্তুকে একমুখী করিলে তাহার বেগ অতিশয় প্রবল হয় তাহার প্রমাণ আর একটি সচরাচর দেখা যায়, যেরূপ নদীর সর্ব্বাঙ্গ রুদ্ধ করিয়া একস্থানে একটি ছিদ্র করিয়া দিলে সেই স্রোতস্বতীর সমস্ত বেগ একত্রিত হইয়া এক মহান্‌বেগ উপস্থিত হয় সেইরূপ যোগ প্রণালীতে মনেরও ঐরূপ গতি হইতে পারে।

বৎস! যোগের সাধন জন্য আসন বসন ও দেশ কাল পাত্র ও খাদ্যাখাদ্যের বিশেষ বিচার করিত হয় এবং ইহা সৎগুরুর উপদেশ ভিন্ন কোন মতে সাধন করা যায় না। ইহার আবার বিঘ্ন লক্ষ লক্ষ। অপরিপক্বাবস্থায় সাধন করিতে যাইলে হঠাৎ বিপদ উপস্থিত হয় এমন কি মহা উৎকট রোগের সম্ভাবনা। যোগীগণ সেই জন্য মুমুক্ষুদিগের উপকারার্থে সাধন সম্বন্ধে কতকগুলি ক্রিয়াযোগের উপদেশ করিয়াছেন। সে ক্রিয়া যোগের প্রথম শ্লোকটি এই, তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়া যোগঃ অর্থাৎ তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদাভ্যাস) ও ঈশ্বর প্রণিধান (ধ্যান) এই তিন প্রকার ক্রিয়ার নাম ক্রিয়া যোগ। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রত নিয়মাদি অনুষ্ঠান করার নাম তপস্যা, প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বর বাচক শব্দের জপ, অর্থাৎ অর্থ স্মরণপূর্ব্বক উচ্চারণ করা বা অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকার নাম স্বাধ্যায় এবং ভক্তি শ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইয়া কার্য্য করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান।

বৎস! যোগ শাস্ত্রের মীমাংসা এই যে, যোগাঙ্গ সাধনের দ্বারায়

চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞানের দীপ্তি হয় না এবং জ্ঞানের দীপ্তি না হইলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। এই যোগাঙ্গ যথাঃ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি বা সম্পূর্ণ একাগ্রতা এই আট প্রকার যোগাঙ্গ সাধন করিলে বৃত্তিলয় নামক চরম যোগে সিদ্ধ হওয়া যায়। বৎস! যোগীগণ সাধন বলে অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধ লাভ করিতে পারেন ইহাই ভগবৎ ঐশ্বর্য্য বলিয়া খ্যাত ও ইহাতেই যোগীদিগের যে অসাধারণ ক্ষমতা লাভ হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

বৎস! তোমাকে আমি যে চার প্রকার যোগের কথা বলিলাম তাহার স্থূল মর্ম্ম এক একটী করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

১। মন্ত্রযোগ—প্রণব প্রভৃতি মন্ত্র জপ করিতে করিতে ও দেবতা আরাধনা করিতে করিতে যে মনের লয় উপস্থিত হয় তাহার নাম মন্ত্রযোগ। ভৃগু, কাশ্যপ, প্রচেতা, দধীচি, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি প্রভৃতি ঋষিগণ এই যোগের উপদেষ্টা।

২। লয়যোগ—বৎস! কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রভৃতি কয়েক জন মহাত্মা বলেন যে মানব মাত্রেরই তিন প্রকার শক্তি আছে, একটীর নাম উর্দ্ধশক্তি, আর একটীর নাম অধঃশক্তি এবং অন্যটীর নাম মধ্যশক্তি। এই ত্রিবিধ শক্তির পরস্পর পরিচালনের সাহায্যে এক ঐশ্বর্য্য লাভ হয় তাহাকে মোক্ষ বলে এবং এইরূপ মোক্ষ সাধনরূপ যে যোগ তাহাকে লয় যোগ বলা হয়।

৩। রাজযোগ—মনে ও শরীরে বায়ু স্থির করাই ইহার প্রধান অঙ্গ। ইহাতে প্রাণায়ামের নিতান্ত আবশ্যক, কারণ প্রাণযোগ ব্যতীত আর কিছুতেই শ্বাসবায়ুর স্থিরতা হয় না। দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা এই যোগের প্রথম সাধক।

৪। হটযোগ—গোরক্ষ নামক জনৈক যোগীর মতে এই যোগ ছয় প্রকার যথাঃ—

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি সমৃতানি ষট্॥

অর্থাৎ আসন, প্রাণবায়ুরোধ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয়টী যোগাঙ্গ। এই কয়েকটী যোগে ক্রমে সিদ্ধ হইলেই হটযোগ সাধন হয়।

বৎস! যোগ শব্দটী সকল সাধনেই নিয়োজিত হয় যথা—কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ইত্যাদি।

বৎস! তোমাকে যোগের প্রকৃত মর্ম্ম ও সাধন ফল সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাষমাত্র দিলাম এক্ষণে এই যোগের অধিকারী ও ইহার প্রতিবন্ধক কত প্রকার তাহা শুনিলে জানিতে পারিবে যে, এ যোগ সাধন করা সচরাচর অসাধ্য ও এক প্রকার দুরূহ ব্যাপার।

প্রথমতঃ যোগী হইতে হইলে অনেকটা শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যাহারা সদাসর্ব্বদা ব্যাধিগ্রস্ত, যাহারা বৃদ্ধ, যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না, যাহাদের মানসিক তেজ নাই, যাহারা গৃহবাসী, যাহাদের উৎসাহমাত্র নাই, যাহারা নির্বীর্য্য ক্লীবতুল্য তাহারা যোগের অধিকারী নহে।

বৎস! অধিকারী ঠিক হইলেও অনেক ব্যাঘাত আছে। গৃহে বসিয়া যোগানুষ্ঠান প্রকৃতরূপে হয় না অতএব নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে হয়। সংসারাশক্তি ও লোক সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হয় কিন্তু এরূপ স্থানে বাস করিতে হইবে যথায় ফল মূলাদি ভক্ষ বস্তু লাভ ও গুরুর দর্শনলাভ হয়। যোগীদিগকে আহার বিষয়ে অতিশয় বিচার করিতে হয় তাহাদিগকে হিত, মিত ও মেধ্য দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য কারণ এই ত্রিবিধ আহারের একটু অবিচার হইলে যোগ সিদ্ধ কখনই হইবে না। যোগীকে প্রথমতঃ স্থান, তৎপরে কাল, অনন্তর মিতাহার সর্ব্বশেষে নাড়ীশুদ্ধি অর্থাৎ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করা উচিত। বৎস! যোগাভ্যাস কালে ও তদুত্তর কালে যোগীদিগের অসাবধানতা হেতু কখন কখন এরূপ কঠিন কঠিন রোগ উপস্থিত হয়, যে সে সকল রোগ দুশ্চিকিৎস এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের দ্বারায় দুরপনেয় হইয়া পড়ে।

বৎস! যোগের সম্বন্ধে আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহার

কলিতার ইহাই জানিবে যে, মনস্থির করিবার জন্য যোগ একটী প্রধান উপায়। কিন্তু ইহার সাধনপথে লক্ষ লক্ষ বিঘ্ন আছে। আবার এ সম্বন্ধে সৎগুরু পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে বিশেষতঃ যাহারা গৃহী, পুত্র পরিবার লইয়া ঘোর মায়ায় আশক্ত, দাসত্ববৃত্তি অবলম্বী, সভ্যতার দায়ে নিরন্তর অস্থির, ঘোর ইন্দ্রিয় পরায়ণ, তাহাদের পক্ষে ইহা স্বপ্নবৎ ও দূরাশা মাত্র। বৎস! পূর্ব্বে মুনিঋষিগণ নিরন্তর কেবল এই যোগ সাধন করিয়াই অসাধারণ কার্য্য সকল ও অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন কোন লোককেই যোগ সাধন করিতে অগ্রসর দেখা যায় না তাহার কারণ সৎগুরু দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি গুরুই না মিলিল তাহা হইলে এ বিষয়ে চেষ্টা করাই ভ্রম, কারণ চেষ্টা করিলে কেবল ক্ষতি হয় মাত্র। অতএব বৎস! তোমারযোগ সাধন সম্বন্ধের প্রশ্ন পরিত্যাগ করাই উচিত।

আমি তোমাকে সংক্ষেপতঃ এই কথা বলিতেছি যে, যোগীর সাধন দুরূহ ও বহু বিঘ্ন সঙ্কুল; আবার সিদ্ধ হইলে যে ফল লাভ হয় তাহা ভক্তি-আচার্য্যদিগের মতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না কারণ যোগীগণ দুর্লভ ভগবৎ প্রেম যাহা মুক্তি চতুষ্টয়ের অতীত বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহা প্রাপ্ত হয়েন না।

কর্ম্ম—বেদের কর্ম্মভাগ হইতে যে, মীমাংসা রচিত হইয়াছে তাহার নাম কর্ম্ম মীমাংসা বা পূর্ব্ব মীমাংসা, ইহাই সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। মহর্ষি জৈমিনি এই মীমাংসার প্রণেতা। তিনি বলেন যে বেদ নিত্য বাক্য ইহা কেবল ক্রিয়ারই শাস্ত্র এবং বেদ বিহিত ক্রিয়াদি জীবের ঐহিক ও পারলৌকিক ফলপ্রদ। কর্ম্ম মীমাংসকের মতে জীব নিত্য পদার্থ এবং কর্ম্মফল সেই জীবের উপজীবিকা। বস্তুত কর্ম্ম ভিন্ন মানব ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারে না এইজন্য প্রকৃতি ধর্ম্মে উত্তেজিত হইয়া মানব সহসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অতএব জৈমিনি বলেন "চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্ম ইতি" এই সত্যের প্রমাণ গীতা-তাতেও দেখিতে পাওয়া যায় যথা—কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকৃতি জৈর্গুণৈঃ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রভাবে সকল লোক অবশ হইয়া

কর্ম্ম করিয়া থাকেন। মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত কর্মকাণ্ড বেদ ভাগের বিচার মাত্র। ইনি জন সমাজের মঙ্গলার্থে অর্থাৎ যাহারা যোগ সাধন দ্বারা মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে অনিচ্ছুক কেবল বিধি ও প্রবৃত্তির দাস হইয়া বৈদিক সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও শ্রৌত স্মার্ত্ত প্রভৃতি ক্রিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ঐহিক সুখ ও পারলৌকীক স্বর্গভোগ প্রার্থনা করেন তাহাদের জন্যই পূর্ব্বমীমাংসা রচনা করিয়াছেন। বস্তুত যখন কর্ম্মীর সংখ্যাই অধিক তখন এ সকল অধিকারীগণ যাহাতে অবৈধ কার্য্য না করিয়া ফেলে সেই জন্য কর্ম্ম মীমাংসার আবশ্যক। কর্ম্মীগণ জানেন যে অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ক্রিয়া করিলেই আত্মতুষ্টি লাভ হয় এবং তাহাই পরম ধর্ম্ম। তাহারা জানেন যে বেদ কেবল ক্রিয়ারই শাস্ত্র, ব্রহ্মের প্রতিপাদক নহে। সেই জন্য তাঁহারা ক্রিয়াকে সর্ব্ব পুরুষার্থ বিবেচনা করিয়া কেবল শ্রুতি বিহীত যাগ, যজ্ঞ, হোম ও পিতৃ পুরুষগণের উদ্দেশ্য হব্য কব্য প্রদান করিয়াই জীবনের উদ্দেশ্য সফল মনে করেন কিন্তু তাহাদের মন সর্ব্বক্ষণ কর্ম্মফলে আশক্তি থাকায় তাঁহারা সহজে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারেন না এবং সেই সকল অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার ভোক্তা যে ভগবান তাহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হয়েন। ইহাদিগের মন চিরদিন ফল কামনা রূপ জঞ্জালে আশক্ত থাকায় বহু সহস্র যুগ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়াও তাহারা কেবল মাত্র অস্থায়ী ফল ভোগ করেন এবং যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হয় কখনই ভগবানকে দর্শন বা তাহার কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। সেই জন্য শ্রুতিতে কথিত আছে "পরমেশ্বরকে অবগত না হইয়া বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত হোম যাগ যজ্ঞ তপস্যা ইত্যাদি করিলেও অস্থায়ী ফলমাত্র লাভ হয়" (যো এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে, তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ সহস্রান্য ন্তবদেবাস্যতদ্ভবতি)। বৎস! কর্ম্মফল বাসনায় যে সকল বে স্মৃতি ও আগমাদি শাস্ত্র বিহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান করা হয় তাহা যে পর্য্যন্ত কামনাশূন্য না হয়, অসার অনিত্য বলিয়া জানিবে কারণ তাহাতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অত্যাবশ্যকীয় যে চিত্তের বিশুদ্ধতা তাহা লাভ হয় না সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই।

জ্ঞান যোগ—মানবের বহু জন্ম পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্তরূপ সকাম কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন সকাম ক্রিয়া ফল অনিত্য বোধ হয় ও যখন হৃদয়ে বৈরাগ্যের অঙ্কুর প্রকাশিত হয় এবং সংসারের সার ভগবানকে জানিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হয় তখনি সংসার সুখে অতৃপ্ত ও অশান্তিতে বিদগ্ধ সাধক উন্মত্ত হইয়া মোক্ষের জন্য সৎগুরুর আশ্রয় লয়েন। বেদান্তসারে কথিত আছেঃ—"অয়মাধিকারী জনন মরণাদি সংসারানল সন্তপ্তো দীপ্তশিরা জল রাশি মিবোপহার পানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠা গুরু মুপস্মৃত্য তমনুসরতি" অর্থাৎ যে রূপ মস্তকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে দৌড়িতে দৌড়িতে জলাশয়ে গমন করে সেইরূপ সংসারানলে সন্তপ্ত হইয়া জীব তীব্র বৈরাগ্য সহ সমদমাদি গুণ সম্পন্ন গুরুর সমীপে উপস্থিত হয়েন।

বৎস! যেরূপ কর্ম্মীদিগের দর্শনকার মহর্ষি জৈমিনি বেদের ক্রিয়াভাগ সংগ্রহ করিয়া কর্ম্ম মীমাংসা রচনা করিয়াছেন, সেইরূপ বেদের উত্তর পাদ হইতে জ্ঞানাংশ সংগ্রহ পূর্ব্বক যে মীমাংসা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নাম "উত্তর বা ব্রহ্ম মীমাংসা" বাদরায়ণ ব্যাসদেব তাহার প্রণেতা। এই মীমাংসা বেদের অন্তভাগ এজন্য ইহাকে বেদান্তও বলে। বেদান্ত মতে— ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য পদার্থ জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব মায়িক মাত্র। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম শুভাশুভ ফল ভোগ মায়িক ও অসত্য। শুক্তিতে যেরূপ রজত জ্ঞান, রজ্জুতে যেরূপ সর্প বোধ এবং কাচে যেরূপ বারি বুদ্ধি উপস্থিত হয় সেইরূপ জীবের পক্ষে এই মিথ্যার পরিণাম স্বরূপ জগতকে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে কিন্তু শুক্তি রজ্জু ও কাচের জ্ঞান হইলে যেরূপ আর ভ্রম থাকে না সেইরূপ ব্রহ্ম চৈতন্যের জ্ঞান হইলে আর মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয় না। বেদান্ত মতে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ তিনটী শরীর স্বীকৃত হয়। রক্ত মাস অস্থি নির্ম্মিত যে দেহটী বাহ্যত দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই স্থূল দেহ, আর মনঃসহিত একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়কে সূক্ষ্ম দেহ বলে; এবং জীবের অনাদি বাসনা, অদৃষ্ট, অবিদ্যা, অজ্ঞান ও মায়া মোহ স্বরূপিণী যে প্রকৃতি তাহাই কারণ শরীর বলিয়া উক্ত। এই ত্রিবিধ দেহ রাজ্যের মধ্যে

কারণ দেহটী সুষুপ্তি। যত দিন পর্যন্ত এই দেহটী নাশ না হয় তত দিন জীবের সংসার গতি হইতে উদ্ধার হইবার যো নাই সুতরাং মুক্তি হওয়াও অসম্ভব। জ্ঞানীদিগের মতে এক চৈতন্য ছাড়া সকলি মায়া ময় অতএব সেই মায়ার অতীত না হইলে চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মাকে জানা যায় না জ্ঞান সাধন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত দেহ ত্রয়ের মায়ায় আশক্ত না হইয়া কেবল এক মাত্র পরমপ্রেমাস্পদ আনন্দ স্বরূপ সচ্চিতানন্দ ঈশ্বরেই অভিনিবেশ থাকা উচিৎ। বৎস! বেদ স্মৃতি বিহিত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ফলকে অনিত্য জ্ঞান করত তৎসমস্ত কর্ম্ম-ফল ত্যাগ করাই চিত্ত শুদ্ধির মূল কারণ, গীতার আদ্যোপান্ত এই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়েই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বেদান্তের—"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" এই সূত্রে পষ্টই বলা হইয়াছে যে চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার মূল কারণ। বৎস! জ্ঞানের দ্বারায় ব্রহ্ম দর্শন লাভ হয় কিন্তু তাহা হইলেও সাধকে ও ভগবানে অনেক পার্থ্যক থাকে এবং ইহার অবান্তর ফল যে মুক্তি তাহা দুর্লভ প্রেমের নিকট তুলনা হয় না। এ বিষয় আমি তোমাকে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দ্বারা ক্রমে পরিষ্কার রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ভক্তি—বৎস! যখন ঋষিগণ দেখিলেন যে, কর্ম্ম, জ্ঞান, ও যোগ ইত্যাদিতে নানাপ্রকার কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হয় বলিয়া লোকে সহসা ইহাতে অগ্রসর হইতেছে না তখন তাঁহারা বেদ মন্থনপূর্ব্বক ইহার সার সংগ্রহ করত অতি সুখকর সুগম ও সহজ সাধ্য মধুর ভক্তিসূত্রাদি প্রণয়ন করিলেন। দেবর্ষি নারদ ও ঋষি শাণ্ডিল্য প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তি আচার্য্য যে সকল অপূর্ব্ব সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মনে পরম শান্তি উপস্থিত হয়। মহামুনি বেদব্যাসও সমগ্র বেদ মন্থন করত যে অমৃতপ্রদ ভাগবত শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে অমৃত সাগরে ডুবিয়া যাইতে হয় (নিগম কল্প তরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃত দ্রবসংযুতম্। পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরুহো! রসিকা! ভুবি ভাবুকাঃ।)

বৎস! ভক্তির প্রয়োজনতা সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ কারণ

বলিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনে যে অবান্তর ফল লাভ হয় তাহাতে ভগবানের দর্শন ও জ্ঞান হয় মাত্র কিন্তু তাহা হইলেও সাধকে ও ভগবান অনেক ব্যবধান থাকে সেইজন্য মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন—"দর্শন ফলমিতি চেন্নতেন ব্যবধানাৎ" অর্থাৎ দর্শন লাভই ফল নহে কারণ তাহা হইলেও সাধকে এবং ভগবানে অনেক ব্যবধান থাকে। নারদের মতে ভক্তি দ্বারাই কেবল ভগবানে সহিত বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, ইহাতেই ভগবানের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইতেও তাহার বিশেষ কৃপালাভ করিতে পারা যায়। ভক্তিতেই তিনি বশীভূত হইয়া পড়েন এবং সাধকের জন্য সর্ব্বক্ষণ অস্থির হইয়া থাকেন। নারদাদি ঋষিগণ সেইজন্য ভক্তিপথ প্রকাশ করত জীবের কল্যাণার্থ উর্দ্ধ বাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে জগতে বলিয়াছেন—"ওঁ তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্" অর্থাৎ হে জীব! এক ভক্তিই সাধন কর, ইহা ভিন্ন ভগবানকে লাভ করিবার সরল রাস্তা আর নাই। বস্তুত যোগীগণ কেবল ভগবানকে দর্শন করেন, কর্ম্মীগণ সুখের আশায় কখন স্বর্গে কখন মর্ত্তে ঘুরিয়া মরেণ, এবং জ্ঞানীগণ ভগবানকে জানিতে পারেন কিন্তু ভক্তির অনুরাগে তিনি আবদ্ধ হয়েন। রামচন্দ্রের গুহকের সহিত যে মিত্রতা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে দীন দরিদ্র সুদামা ব্রাহ্মণের সহিত সৌহার্দ্য হইয়াছিল এবং শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত যে সামান্য থোড় কলা বিক্রেতা শ্রীধরের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল তাহা এই ভক্তি অনুরাগের কৌশলেই জানিবে। বস্তুত কি জগতের লৌকিক ব্যবহারে, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি পরমার্থ পথে, সর্ব্বত্রই এই মনের প্রগাঢ় অনুরাগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুখকর পথ জানিবে। যাহারা (যোগীগণ) কেবল মাত্র দর্শন করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করেন, যাঁহারা (কর্ম্মী) যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া করত কখন স্বর্গে কখন মর্ত্তে ঘুরিয়া বৃথা কাল হরণ করেণ, যাঁহারা (জ্ঞানী) কেবল মাত্র জেনে শুনেই বেকসুর খালাস বিবেচনা করেন তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয় না একথা ভক্তি আচার্য্যগণ ভূয়ো ভূয়ঃ বলিয়াছেন।

বৎস! নারদের "ওঁ নত্তেন রাজ পরিতোষ ক্ষুধা শান্তি র্বা" অর্থাৎ ইহাতে রাজারো পরিতৃপ্তি হয় না এবং ক্ষুধার শান্তি হয় না এই সূত্রার্থে স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে যে কেবলমাত্র ভগবানকে জানিলেই তাহাতে প্রীত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বস্তুত যদি তুমি জানিতে পার যে কাশ্মিরের রাজা অতিশয় দয়াবান বদান্য ও পর-হিতৈষী তাহা হইলে তোমার সেই জানাতে কাশ্মিরের রাজার সন্তুষ্টি হইবার কোন কারণ নাই। আবার ছানা চিনির যোগে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয় এ কথা শুনিলে যেরূপ তোমার ক্ষুধা শান্তি হয় না এবং তৃপ্তি লাভ হয় না সেইরূপ ভগবান দয়ার সাগর তাঁহার কৃপা হইলে মুক্তি হয় এ কথা কেবল জানিলেই ভগবান সুপ্রসন্ন হয়েন না এবং তোমারো তদ্দারায় ভবক্ষুধার শান্তি হয় না। বৎস! যেরূপ ক্ষুধা শান্তির জন্য মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে হয় সেইরূপ ভগবানকে সেবা ভক্তি দ্বারা সুপ্রসন্ন করিলে তবে তাঁহার অমৃত স্বরূপ আস্বাদন করিতে পারা যায় এবং এইরূপ আস্বাদন করিলে তবে শান্তি হয় ও ভবের ক্ষুধা মিটিয়া সর্ব্বকামনা পরিতৃপ্ত হয়।

ভক্তি শাস্ত্রের এইটীই সার সিদ্ধান্ত যে ভক্তি মুক্তি ও কর্ম্মি সকলেই অশান্ত কেবল একমাত্র ভক্তই শান্ত সেই জন্য ভাগবতে কথিত হই-য়াছে যে, "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ। সুদুর্লভ প্রস-ন্নাত্মা কোটিস্বপি মহামুনে" অর্থাৎ কোটি কোটি সিদ্ধ কামী ও মুক্তের মধ্যে এক জন প্রসন্নাত্মা ভগবৎ ভক্ত পাওয়া দুর্লভ। ভক্তি-সূত্রকারগণ বলেন যে যাবদীয় সাধনে এই ভক্তির সাহায্য লইতে হয় কেবল ভক্তিই একমাত্র মুখ্য সেই জন্য শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন "সা মুখ্যে তরা পেক্ষিতত্বাং" ভক্তিই একমাত্র মুখ্য।

বৎ! এরূপ আনন্দপ্রদ এবং সর্ব্বসাধনের সার ফলপ্রদ সহজসাধ্য ভক্তিকে পরিত্যাগ করত যে সকল লোক দুর্ভাগ্য বশতঃ অন্য ২ দুরুহ-সাধনে ক্লেশ করেন তাহাদিগের তুষারঘাতি লোকের ন্যায় ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যেমন ধান্য পরিত্যাগ করত তুষ (যাহা ধান্যবৎ

প্রকাশ পায়) লইয়া অপঘাত করিলে কোন ফল লাভ হয় না তেমনি ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া অন্য সাধনে যত্ন করিলে কিঞ্চিৎ মাত্র ফললাভ হয় না কেবল ক্লেশমাত্র হইয়া থাকে। (শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তি মুদাস্যতে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধ লব্ধয়ে তেষামসৌ ক্লেশেন এব শিষ্যতে নান্যদ্যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাং॥) হে বৎস! ভক্তিশাস্ত্রে ইহাই সার সিদ্ধান্ত যে জীবের সংসারগতির মূল কারণ কেবলমাত্র "অভক্তি" সেইজন্য ঋষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন:—সংসৃতিরেষাম ভক্তিঃ স্যান্নাজ্ঞা নাৎকারণাসিদ্ধেঃ॥ অর্থাৎ জীব যে বারম্বার সংসারে গমনাগমন করে "অভক্তিই" তাহার প্রধান কারণ।

বৎস! সংক্ষেপত তুমি ইহাই জানিয়া রাখ যে ভক্তি না থাকিলে কোন সাধন সরস বোধ হয় না। ভক্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম না করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না, আবার ভক্তি ভিন্ন যে জ্ঞান তাহা বিড়ম্বনামাত্র সেইজন্য নীরস জ্ঞানকে শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ঃ তিরস্কার করিয়াছে। বৎস! কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্যই "নিষ্কাম কর্ম্ম" জানিবে ইহার সম্বন্ধে ভগবান নিজে গীতা শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাই প্রকৃত কর্ম্মী, প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত ভক্ত জানিবে নতুবা সকাম ও পৌরুষাভিমানে যে কোন সাধন কর না কেন তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বৎস! ভক্তির গুণ যে কত তাহা আমি সামান্য কথায় বর্ণনা করিতে অপারক। ইহা সাধন করিতে উচ্চ নীচ বিচার নাই, জ্ঞানী অজ্ঞানীর বিচার নাই, ইহাতে সকলেরি অধিকার আছে অথচ ইহা সাধন করিতে যদি কোন বৈগুণ্য হয় তাহাতে কিছুমাত্র প্রত্যবায় হয় না, এমন কি শাস্ত্রকারগণ সারসিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সামান্য ভক্তি অনুষ্ঠান করিলেও মহৎ ফল লাভ হয়। জ্ঞানহীন বালক ও স্ত্রী পুত্রাদি যাহাদিগের বেদে অধিকার নাই, এমন কি সামান্য পশু পক্ষী পর্য্যন্ত যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান মাত্র নাই তাহারাও যদি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের উদ্দেশ্যে ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন তাহা হইলে

ভগবান সুপ্রসন্ন হয়েন। বৎস! তুমি ধ্রুবের কথা শুনিয়াছ তো; আহা! পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুবই প্রকৃত ভক্তের আদর্শ তাহার কিছুমাত্র শাস্ত্র জ্ঞান ছিল না কিন্তু ছিল কেবল ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া সেই দুগ্ধপোষ্য বালক যখন ভক্তিতে কোথায় পদ্ম-পলাশ লোচন হরি এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে অরণ্য মধ্যে ক্রন্দন করিয়াছিলেন তখন ভগবান সেই প্রিয় ধ্রুবকে অবিলম্বে মর্ত্তলোকের সাধারণ মনুষ্যের মধ্য হইতে, অভক্ত পাষণ্ডদিগের সংস্রব ও জ্ঞানগরিমার পুতি গন্ধ হইতে উদ্ধার করত সমুদয় সমৃদ্ধিপূর্ণ সর্ব্বোচ্চ ধ্রুবলোকে স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রজগোপীকাগণ শাস্ত্র না পড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিয়া এক ভক্তির গুণেই ভগবানের পরমপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন অতএব ভক্তির অশেষ গুণ ও ইহা সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োজন ও সর্ব্বসাধনার প্রাণ স্বরূপ জানিবে।

বৎস! আমি তোমাকে ভক্তিই সাধন করা কর্ত্তব্য অথবা "ভক্তিই প্রয়োজন" এই কথা বুঝাইতে যাইয়া যাহা যাহা বলিলাম তাহা যদি তোমার মনে সম্পূর্ণ ধারণা না হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমার নিকট ভক্তনামদেবের চরিত্র বর্ণনা করিতেছি, ইহাতে অবগত হইতে পারিবে যে, ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন না এবং তাঁহাকে ভক্তের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া সকল কার্য্যই করিতে হয় এমন কি ভক্তের জন্য তাহাকে অতি নীচ ঘৃণ্য কর্ম্মও করিতে হয় এবং আরও জানিতে পারিবে যে, যোগ, কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা এক ভক্তিসাধনেই সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ লাভ হয় ও সর্ব্বসুখের নিদানভূত ভগবৎ প্রেমও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নামদেব চরিত্র।

নামদেবের জন্ম বৃত্তান্ত অতি রহস্যপূর্ণ, তাঁহার মাতামহ বামদেব ছিপী কর্ম্মকার ছিলেন এবং কোন মতে সেই বৃত্তিতে জীবন যাপন করিতেন। অল্প বয়সে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। তাঁহার অভিভাবকের মধ্যে এক কন্যা ছিল, এজন্য সর্ব্বদাই ভাবিতেন পুত্রাদি হইল না বিপ্রসেবা কে করিবে। ক্রমে বিধবা কন্যাটীকে সেবা কার্য্যাদি সমস্ত শিখাইলেন কন্যাটীও অতিভক্তিপূর্ব্বক কিছু দিবস ভগবৎ সেবা করিলে শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন। অল্পবুদ্ধি মায়ামুগ্ধ কন্যার মনে উদয় হইল যে, একটী পুত্র হইলে বড় ভাল হয় সেই জন্য সে ভগবানের নিকট সেইরূপ বর চাহিল। হরি সন্তুষ্ট হইয়া কন্যাটীকে সেইরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন বামদেব এ সকল কিছুই জানিতে পারিলেন না। কালে সেই বিধবা কন্যার গর্ভে বিনা পুরুষ সঙ্গমে পুত্র সন্তান হইলে কন্যার পিতা যার পর নাই লজ্জিত হইলেন কিন্তু ভগবানের লীলা বুঝিবে কে—ব্রাহ্মণকে বিশেষ লজ্জিত হইলেন দেখিয়া আদেশবাণী হইল যে তোমার লজ্জিত হইবার কোন কারণ না—আমার বর প্রভাবে তোমার কন্যার গর্ভে সন্তান হইয়াছে আর ঐ সন্তান একজন অদ্বিতীয় ভগবৎ ভক্ত হইবে। ব্রাহ্মণ দৈববাণী শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এ দিকে নামদেব জন্মগ্রহণ করিয়া দিন দিন শশী কলার ন্যায় বর্দ্ধিত হয়ত মাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য সেই বালক অতি অল্প বয়সেই এক জন মহাভাগবত বলিয়া পরিচিত হয়েন এমন কি ভগবানের নাম শুনিলেই তিনি ভক্তিতে বিহ্বল হইতেন। বয়স্য বালকগণ নানা প্রকার বাল্যক্রীড়া করিত কিন্তু নামদেব কৃষ্ণপূজা ভিন্ন অন্য কোন ক্রীড়া জানিত না। তিনি তাহার মাতামহ বামদেবের নিকট প্রত্যহ ক্রন্দন করিয়া বলিতেন আমাকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুণ। মাতামহ সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন তুমি একটু বড় হইলে কৃষ্ণসেবা করিও। একদিন বামদেব কার্য্য বশতঃ স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হইয়া নামদেবকে বলিলেন

বাপু আমার দুই তিন দিবস দেরি হইবে তুমি ঠাকুরের সেবাকার্য্য করিও বালক ভগবৎ সেবার কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত। মাতামহ স্থানান্তরে গমন করিলে নামদেব অতি পবিত্র ও শ্রদ্ধাসহকারে বিগ্রহ পূজা সমাপন করিয়া উত্তম দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করত অতিভক্তি সহকারে ঠাকুরের অগ্রে রাখিয়া বলিলেন, প্রভো! ক্ষীর ভোজন কর। বালক জানিত না যে ভগবান ভোজন করেন না নিবেদন করিলেই তাঁহার ভোজন হয়। সে অতি প্রীত মনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখিল যে ঠাকুর ক্ষীর খাইলেন না তখন মনে মনে চিন্তা করিল বোধ হয় ঠাকুর আমার সম্মুখে খাইবেন না এই স্থির করিয়া বাহিরে গেল এবং অনেক ক্ষণ পরে আসিয়া দেখিল যেখানকার ক্ষীর সেই খানেই আছে। সরলমতি বালক তখন ভাবিল একি! ঠাকুর ক্ষীর খাইলেন না কেন বোধ হয় আমার সঙ্গে পরিচয় নাই সেই জন্য খাইলেন না। আবার সন্দেহ হইল হয় ত ক্ষীরে কোন বিঘ্ন হইয়া থাকিবে। বালকের মন! এই রূপ নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় নামদেব ঠাকুরের নিকট অতি বিনীত ভাবে কর যোড়ে বলিলেন প্রভু আমার দাদার নিকট তুমি সকলি খাও আমি কি দোষ করিয়াছি যে আমার ক্ষীর খাইলে না। প্রভু তুমি যদি না খাও তাহা হইলে আমার দাদাকে আমি কি বলিয়া বুঝাইব। যদি তুমি নিতান্ত পক্ষে আমাকে উপেক্ষা কর তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও আমি তোমার অগ্রে প্রাণত্যাগ করিব। বালক দেখিল ইহাতেও ঠাকুর উপেক্ষা করিলেন তখন আর থাকিতে পারিল না অবিলম্বে এক খানি ছুরিকা গ্রহণান্তর যাই গলদেশে দিতে যাইবেন ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন আর থাকিতে পরিলেন না, তৎক্ষণাৎ বালকের হস্ত হইতে ছুরিকা গ্রহণ করতঃ ক্ষীর গ্রহণ করিয়া ভোজন করিলেন। আহা! যদি ভক্তের হৃদগত ভাব ভগবান গ্রহণ না করিতেন, যদি ভক্তের আবদার তিনি না সহ্য করিতেন তাহা হইলে ভক্তের আর সন্তুষ্টি কোথায়! বালক নামদেব ঠাকুরকে ক্ষীর ভোজন করিতে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইল। সে এই রূপে দুই তিন দিবস অতি ভক্তি সহকারে ঠাকুরের সেবা করিলে তাহার মাতামহ বামদেব গৃহে

প্রত্যাগমন করিয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন ক্যামন বাপু ঠাকুরের সেবা কার্য্য উত্তম রূপে হইয়াছে কোন বিঘ্ন হয় নাই ত? নামদেব বলিল প্রত্যহ ঠাকুরের সেবা কার্য্য করিয়াছি তাহাতে বিঘ্ন হয় নাই তিনি আহার করিয়া যে অবশিষ্ট ক্ষীর প্রসাদ রাখিয়াছেন তাহা আপনার জন্য আছে এই বলিয়া বালক প্রসাদ আনিয়া মাতামহের অগ্রে ধরিল। ঠাকুরের আহারের কথা শুনিয়া মাতামহ কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি বাপু ঠাকুর কি নিজে ক্ষীর ভোজন করিয়াছেন না তুমি খাইয়া রাখিয়াছে? বালক এ কথা শুনিয়া একটু লজ্জিত হইয়া বলিল আমি খাই নাই ঠাকুর খাইয়াছেন। বামদেব আশ্চর্য্য বোধ করিয়া বলিলেন না তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ ঠাকুর কখনই আহার করেন নাই। নামদেব তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিলেন কিন্তু বালকের কথায় বামদেবের বিশ্বাস হইল না তিনি বলিলেন তুমি আমাকে দেখাইতে পার? বালক বলিল হ্যাঁ দেখাইব। পর দিবস পুনরায় ক্ষীর লইয়া বালক ঠাকুরের অগ্রে রাখিয়া বলিলেন প্রভু এই ক্ষীর ভোজন করুন নতুবা আজ আর প্রাণ রাখিব না এই বলিয়া বালক অনবরত ক্রন্দন আরম্ভ করিল। আহা! সে ক্রন্দন শুনিলে পাষাণ বিগলিত হয়! দয়ার ঠাকুর বালকের ক্রন্দন কিরূপ সহ্য করিবেন! তৎক্ষণাৎ ক্ষীর লইয়া বালকের সম্মুখে আহার করিলেন। এই অদ্ভুৎ ব্যাপার দর্শন করিয়া বামদেব চরিতার্থ হইলেন এবং আপনাকে ধিকার করত বালকের বহু স্তব স্তুতি করিলেন।

নামদেবর চরিত্রে আমরা আরো অনেক অদ্ভুৎ—ঘটনা দেখিতে পাই। তিনি যে সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে সময় মুসলমান-দিগের অধিকার ছিল। পাতসা নামদেবের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন নামদেব এক জন বিশিষ্ট বুজরুক সেই জন্য তামাসা দেখিবার জন্য নামদেবকে বলিলেন যে তুমি আমাকে কিছু কেরামত দেখাও। নামদেব বলিলেন যদি আমার কেরামত থাকিবে তবে সামান্য সিপীকার্য্য করিয়া দিন যাপন করিব কেন? আমি

কেরামত কিছুই জানি না। ম্লেচ্ছ পাতসা ভক্তের মহিমা কি বুঝিবে সে ভাবিল নামদেব বুঝি তাচ্ছল্য করিল একন্য ক্রোধে অধীর হইয়া নামদেবকে কষ্ট দিবার জন্য কারারুদ্ধ করিল। কিছু দিবস পরে এক দিন পাতসা একটী গাভী বৎসকে মৃত পতিত দেখিয়া নামদেবকে কারাগার হইতে আনাইয়া বলিলেন যদি ইহাকে বাঁচাইতে পার তাহা হইলে জানিব যে তোমার ক্ষমতা আছে। হরিভক্ত নামদেব সর্ব্বদাই বিনয়ে অবনতও সদাই কুণ্ঠিত থাকিতেন কিন্তু পাতসাকে কিছু ভক্তি মহিমা শিক্ষা দিবার জন্য মৃত বৎসের নিকট একটী তুড়ি দিয়া বলিলেন বৎস! শিঘ্র উঠ তোমার মাতা তোমার জন্য ক্রন্দন করিতেছে মৃত বৎস নামদেবের হুকুম শুনিবা মাত্র উঠিয়া চলিয়া গেল। পাতসা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন এবং অনেক স্তব স্তুতি দ্বারায় নামদেবকে বলিলেন প্রভু আপনকার নিকট আমার অপরাধ হইয়াছে মাপ করুণ। পাতসা সেই দিন হইতে নামদেবকে আর ছাড়িতেন না সর্ব্বক্ষণ নিজের নিকটে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এক দিন এক জন লোক মণি মাণিক্য খচিত বহু মূল্যবান বিছানা সহিত এক খানি পালঙ্ক পাতসাকে ভেট দিল পাতসা সেই গুলি লইয়া নামদেবকে উপহার দিয়া বাহক দিগকে আদেশ করিলেন তোমরা বিছানা সহিত পালঙ্ক নামদেবের বাটি ত রাখিয়া আইস। নামদেব বলিল বাহকের প্রয়োজন নাই আমি নিজেই এ গুলি লইয়া যাইব এই বলিয়া সমস্ত গুলি মস্তকে করত একটী নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। রাজার ইঙ্গিত ক্রমে দুই এক জন লোক নামদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া এই ব্যাপার দেখিয়া রাজার নিকট সবিশেষ বলিল। পাতসা নামদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেন বহুমূল্য জিনিস গুলি নদীতে নিক্ষেপ করিলে? নামদেব কহিল উহা এমন কি বহুমূল্য দ্রব্য যার জন্য তুমি আক্ষেপ করিতেছ পুনরায় যদি যে গুলি চাহ আনিয়া দিতেছি এই বলিয়া সে গুলি যেমন লইয়া গিয়াছিলেন সেইরূপ শুষ্ক আনিয়া দিলেন। পাতসা দেখিয়া অবাক হইলেন।

নামদেব যে গ্রামে বাস করিতেন সেই গ্রামের একজন বণিক্

তুলাদান করিয়া বহুবিধ রজত কাঞ্চন দান করিয়াছিলেন সে নামদেবকে বলিল আমার দানকৃত কিছু স্বর্ণ রূপ্যাদি তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পরদুঃখে কাতর নামদেব বণিককে হরিভক্তি যে অমূল্যধন তাহা দেখাইবার জন্য একটী তুলসীপত্রে কৃষ্ণ নাম লিখিয়া দিলেন এই তুলসীর পরিমাণ স্বণ না দিলে আমি গ্রহণ করিব না। বণিক কহিল এত অল্প স্বর্ণ তুমি কি করিবে, নামদেব বলিল ইহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে। বণিক্ তখন তৌলের একদিকে তুলসী রাখিয়া অন্য দিকে সেই পরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করিল কিন্তু তুলা তুলসীর দিকে ঝুলিয়া পড়িল। পুনরায় দ্বিগুণ আনিয়া দিল তাহাতেও ঠিক হইল না, পরে স্বর্ণের পরিমাণ যত বৃদ্ধি করা হইল তুলসী ভারি হইল। পরিশেষে যাবতীয় স্বর্ণ আনিয়া দিলেও তুলসী তত ভারী হইতে লাগিল বণিক তখন কি করে, অগত্যা পরের নিকট কর্জ্জ করিয়া স্বর্ণ আনিল তাহাতেও তুলসীর সমতুল্য হইল না দেখিয়া বিস্মিত হইল। নামদেব তখন হরিনামের মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিলেন হরিভক্তি ভিন্ন কিছুই মূল্যবান নহে। দান, ধ্যান, তপ, যপ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম হরিভক্তি ভিন্ন বৃথা। বণিক তখন ভক্তিতত্ত্ব অবগত হইয়া নামদেবের পদে পতিত হইলেন এবং সর্ব্বস্ব দিয়া তাহার নিকট হরিনাম ক্রয় করিলেন।

একদিন নামদেব রঙ্গনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার সময় আরতি দেখিতে গিয়া দেখেন যে, এত ভিড় যে কাহারো সাধ্য নাই ভিতরে প্রবেশ করে। নামদেব প্রভুর আরতি দেখিব বলিয়া প্রাণপণে সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া ভিতরে যাইলেন কিন্তু পূজারি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া এবং বহু তিরস্কার করিয়া দূরীভূত করিয়া দিল। নামদেব ইহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া মন্দিরের পশ্চাৎদিকে গমন করতঃ বলিলেন প্রভু! পূজারিরা আজ আপনাকে দর্শন করিতে দিল না, যাহাহউক, আজ আপনাকে কিছু গীত শুনিতে হইবে এই বলিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। আহা! ভগবানের লীলা কে বুঝিবে ভক্তবৎসল ভগবান সেই গীতে মোহিত হইয়া মন্দিরসহ যে দিকে নামদেব চক্ষু মুদ্রিত

করিয়া সঙ্গীত করিতেছিলেন সেইদিকে ফিরিলেন। পুরারি ব্রাহ্মণগণ তখন নামদেবের পদে পতিত হইয়া অনেক স্তব স্তুতি করিলেন। শুনা যায় সেই মন্দির অদ্যাবধি সেই ভাবেই আছে। ভক্তের চরিত্রে ভগবান যে সকল অদ্ভুত লীলা করেন তাহা সহজ বুদ্ধিতে কে বুঝিবে।

এক সময়ে ভগবান ভক্ত নামদেবকে ছলনা করিবার জন্য ব্রাহ্মণবেশে একাদশীর দিবসে তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নামদেবের একাদশীতে বড় নিষ্ঠা, সে দিন কোন প্রাণিই তাঁহার বাটীতে আহার করিতে পায় না। ছদ্মবেশী ভগবান ছল ক্রমে নামদেবকে বলিলেন আমাকে আজ কিছু আহার করাও আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। নামদেব বলিল আজ হরিবাসর, অন্ন আহার করিতে পারিবেন না; ব্রাহ্মণ বলিল যদি আমি অন্ন খাই তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই, নামদেব বলিল তাহা কদাপি হইবে না আমি একাদশীর দিন অন্ন দিতে পারিব না। ব্রাহ্মণ যখন দেখিল নামদেব কিছুতেই অন্ন দিবেন না তখন হঠাৎ মৃত্যুপ্রায় হইয়া পড়িল কিছুমাত্র সংজ্ঞা রহিল না। গ্রামস্থ যাবদীয় লোক এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই নামদেবকে বহু তিরস্কার করত বলিল তুমি অতিথীকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়াও কেন অন্ন না দিলে এই কি তোমার ধর্ম্ম। নামদেব এসকল কথায় বড় কান দিলেন না, কেবল বলিলেন ব্রাহ্মণ মরিয়াছে আমিও উহার সহিত মরিব তথাপি অন্ন দিতে পারিব না। নামদেবের যে কথা সেই কাজ তৎক্ষণাৎ চিতা সাজাইয়া অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে যেমন শব দেহ সহ নিজে প্রবেশ করিলেন অমনি অগ্নি স্পর্শ মাত্র মৃতদেহ জীবিত হইল। সকল লোকে দেখিয়া অবাক হইল। বস্তুত ভগবানের লীলা বুঝিবে কে শব রূপী ভগবান তখন জীবিত হইয়া নামদেবকে বলিলেন আমি তোমার একাদশীর নিষ্ঠা শুনিয়া পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। ভক্ত নামদেব তখন ছদ্মবেশী ভগবানের শ্রীপদে পতিত হইয়া ক্রন্দন করত বহু স্তব স্তুতি দ্বারায় তাঁহাকে ভোজন করাইলেন।

এক সময় নামদেবের গৃহে অগ্নি লাগিয়াছিল। গ্রামস্থ লোক যাই তাহার ঘরের দ্রব্যাদি বাহিরে আনিতে লাগিল নামদেব অমনি দৌড়িয়া সেই সকল দ্রব্য পুনরায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যখন ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না তখন তাঁহার ইচ্ছাই সম্পন্ন হউক এ সকল দ্রব্যাদি অগ্নিতে দাহ হওয়াই চাই আর এ অগ্নিও নির্ব্বান করা উচিত নহে কারণ তাহা হইলে তাঁহার প্রভুর লীলা ভঙ্গ হইবে। সকল লোকই নামদেবের কার্য্য দেখিয়া ও তাহার প্রলাপ বাক্য শুনিয়া তাহাকে পাগল বলিয়া প্রস্থান করিল। অগ্নি নির্ব্বান হইলে ভগবান নামদেবকে ছদ্মবেশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার ঘর এবং দ্রব্যাদি অগ্নিতে পুড়িল তৈয়ারি করিবে না? নামদেব সহাস্য বদনে বলিলেন যিনি পোড়াইয়াছেন তিনিই তৈয়ারি করিয়া দিবেন। ভক্তবৎসল ভগবান তখন আনন্দে পুলকিত হইয়া "ভক্তের বোঝা বহন" না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। খড় দড়ি ইত্যাদি সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক নিজে সেই ঘর প্রস্তুত করিয়া নানাপ্রকার সুন্দর দ্রব্যাদি দ্বারায় তাহা সুশোভিত করিয়া দিলেন। বৎস! লোকে হয়ত সন্দেহ করিবে যে, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা তিনি একজন সামান্য লোকের জন্য খড় দড়ি আনিয়া ঘর তৈয়ার করিবেন কেন। যিনি ইচ্ছা করিলে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারেন তাহার পক্ষে সামান্য ঘর তৈয়ারি রহস্য জনক! বৎস! যাহারা ভগবানের লীলারহস্য ভাল রূপে বোঝে না, ভগবানের ভক্তবৎসলতা জানে না তাহারাই এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকে। বস্তুত ভগবান অবতার হইয়া যাহা যাহা করেন তাহা লৌকিক প্রথা অনুযায়ী কখনই লোক ব্যবহার বিরুদ্ধ নহে। সংসারে যদি ভগবানকে দেখিতে হয় বা তাঁহার লীলা-রহস্য জানিতে হয় তাহা হইলে ভক্তের ক্রিয়াকলাপ দ্বারাই দেখিলে ঠিক হয় নতুবা সে অদ্ভুত ব্যাপার সহজে বোধগম্য হয় না। ভক্তি আচার্য্যগণ বলেন যে, ভগবৎ ভক্তিবিহীন হইয়া সহস্র কল্প জীবিত

থাকা অপেক্ষা ভগবৎভক্তি লাভ করতঃ ক্ষণমাত্র জীবিত থাকাও প্রার্থনীয়। অতএব ভক্তিই যে প্রয়োজন এবং একমাত্র সাধনীয় এ কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

ভক্তির স্বরূপ।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

শিষ্য। প্রভো! আপনার মুখে ভক্তি মহিমা ও ভক্তির প্রয়োজনতা শুনিয়া আমি অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম কিন্তু ভক্তি যে কি পদার্থ তাহা এখনও হৃদয়ে ধারণা হয় নাই অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুণ।

গুরু। বৎস! ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মত ভেদ আছে; কেহ ভগবৎ পূজাদিতে অনুরাগকে ভক্তিবলেন, কেহ কীর্ত্তনাদিতে অনুরাগকে ভক্তি বলেন, কেহ আত্মরতির অবিরোধী বিষয়ে অনুরাগকে ভক্তি বলেন, আবার কেহ সমস্ত কর্ম্মফল ভগবৎ চরণে অর্পণ করাকে ভক্তি বলেন, যাহা হউক বিভিন্ন মতের মধ্যে ইহাই সার সিদ্ধান্ত যে ভগবানের উপর যে ঐ কান্তি অনুরাগ তাহাই ভক্তি।

বৎস! "ভগবানের উপর অনুরাগ" বড় সহজে উদয় হয় না কারণ সংসারের মায়ায় জীব মাত্রেই মোহিত এবং সংসার সম্বন্ধেই অনুরাগ সর্ব্বক্ষণ আবদ্ধ থাকে কিন্তু ভগবানেগ আশ্চর্য্য কৌশল এই যে, জীব সংসারে পরস্পরের মধ্যে অনুরাগসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎ অনুরাগ শিক্ষা করে। সংসারে এ পরীক্ষায় প্রকৃত বিদ্যালয়। এ সংসারে অনুরাগ ভিন্ন কোন কার্য্যই হয় না এবং ইহা সর্ব্বজীবের হৃদয়ে তারতম্যানুসারে নিহিত আছে বলিয়াই সংসার, নতুবা এ সংসারের বন্ধন ক্ষণমাত্র ছিন্ন ভিন্ন হয়। বস্তুত পিতামাতার সন্তানের উপর অনুরাগ এবং সন্তানের পিতামাতার উপর অনুরাগ প্রভুর ভৃত্যের উপর এবং ভৃত্যের প্রভুর উপর, স্ত্রীর স্বামীর উপর এবং স্বামীর স্ত্রীর উপর, বয়স্তে বয়স্তে প্রগাঢ় অনুরাগ জাজ্জল্যমান রহিয়াছে বলিয়াই সংসার এত সুমধুর বোধ

হয়। অতএব এই সর্ব্ব জীবের হৃদয় নিহিত অনুরাগই সংরার বন্ধনের মূল কারণ এবং পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে ইহাই বিভিন্ন নামে অভিহিত হয় পিতা মাতার পুত্রের উপর যে অনুরাগ তাহা স্নেহ বলিয়া পরিচিত, সন্তানের পিতা মাতার উপর যে অনুরাগ তাহা শ্রদ্ধা নামে অভিহিত, স্ত্রী ও স্বামীতে যে অনুরাগ তাহা প্রনয় এবং বন্ধুর সহিত যে অনুরাগ তাহাকে বন্ধুতা বলা যায় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্নেহ, শ্রদ্ধা, প্রনয়, বন্ধুতা ইত্যাদি সকলি এক অনুরাগেরি অঙ্গ ভেদ ও নামান্তর মাত্র। বৎস! যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অনুরাগ সংসারিক বিষয়ে বা জীবে জড়ীভূত থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা মান সম্ভ্রম ধন ঐশ্বর্য্যাদি প্রবৃত্তি পথের সম্বল সকল অর্পন করে কিন্তু ইহা ভগবানে আকৃষ্ট হইলে ভক্তি, প্রেম, ভাব, মহাভাব প্রভৃতি নিবৃত্তি মার্গের পরম সম্পদ সকল সাধককে অর্পণ করে। বৎস! জীব সংসার মায়ায় সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকাতে এই দুর্লভ ভগবৎ অনুরাগ সহসা স্ফুর্ত্তি পায় না কিন্তু যে পরিমাণে সংসার মায়া কমিতে থাকে সেই পরিমাণে উহা বৃদ্ধি হয় জানিবে।

শিষ্য। প্রভো! ঐকান্তিক অনুরাগ বা ভক্তির লক্ষণ কি আমায় বলুন।

গুরু। বৎস! ঐকান্তিক অনুরাগের লক্ষণ কিরূপ তাহা দেবর্ষি নারদ নিজের স্থত্রে পরিস্কার রূপে বলিয়াছেন যথা—"ওঁ ব্রজগোপীকানাং" অর্থাৎ যেরূপ বৃন্দাবন বিহারিণী গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ অনুরাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন ঠিক সেইরূপ অনুরাগই ভগবৎভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বৎস! গোপিকাদিগের সংসার মায়া কিছুমাত্র ছিল না তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শ্রবণমাত্র স্বামী পুত্র ও গুরুজনদিগকে পরিত্যাগ করত উর্দ্ধশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণের নিকট দৌড়িয়া যাইত। তাহারা কৃষ্ণচরণে চিরদিনের জন্য এরূপে প্রাণ বিক্রীত করিয়াছিল যে, ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদে তাহাদের প্রাণ বিয়োগ হইত এবং কৃষ্ণ বিরহে তাহারা মদ্যপায়ী মাতালের ন্যায় গৃহ সংসার লোক লজ্জা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া কি অরণ্যে, কি পর্ব্বতে, কি সরোবরে কি রাত্রে, কি দিবায়, উন্মাদ হইয়া ভ্রমণ করিত।

এই সকল গোপবধুগণ যে কতদূর প্রেমিকা ছিলেন তাহা আমি সামান্য কথায় কি বলিব উদ্ধবাদি ভক্তগণও প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে উদ্ধবকে গোপীগণের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন।

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণাঃ মদর্থে ত্যক্ত দেহিকাঃ।
যে ত্যক্ত লোক ধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্বিভর্ম্যহং॥
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরোহোৎকণ্ঠঃবিহ্বলা॥
প্রধাবয়ন্তি কৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমন সন্দেশৈর্ব্বল্লভ্যো মে মদাত্মিকাঃ॥

হে উদ্ধবঃ গোপীগণ আমাতেই মন প্রাণ অর্পন করিয়াছে আমিই তাহাদের এক মাত্র প্রাণ স্বরূপ আমার জন্য তাহারা সমস্ত ব্যাপার ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা আমাকে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর বলিয়া জানে এবং আমি দূরে থাকিলেও তাহারা আমাকে স্মরণ পূর্ব্বক নিদারুণ বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিয়া আছে। আমিই সেই বৃন্দাবন বিহারিণী গোপীগণের আত্মা এবং তাহারাও আমারই জানিবে।

গোপিকাদিগের ঐকান্তিক অনুরাগই যে পরম ভক্তি এ কথা একটু চিন্তা করিলেই অনুভূত হয়; "আমি তোমাকেই চাহি আর কাহাকে চাহি না অথবা আমি তোমা ভিন্ন থাকিতে পারি না" ইহাই গোপ বধুদিগের মনোভাব ছিল ইহাই প্রকৃত পক্ষে ঐকান্তিক অনুরাগ।

বৎস! দিক্‌দর্শন যন্ত্রের লৌহ সূচিকাটী বারম্বার ঘুরাইলেও এক উত্তর দিক ভিন্ন অন্য দিকে যায় না সেই রূপ সর্ব্ব প্রকার প্রলোভনে নানা প্রকার বিপদ সম্পদের মধ্যে, নানা প্রকার কঠোর পরীক্ষায় পতিত হইয়াও নানা প্রকার বিষয় ব্যাপারের মধ্যে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা অতিক্রম পূর্ব্বক যখনি সদা কাল এক ভগবৎ চরণে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় অন্য কোন দিকে চিত্ত আকর্ষিত হয় না তখনি ঐকান্তিক অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ হয়। প্রকৃত ভক্তি বা ঐকান্তিক অনুরাগের লক্ষণ বুঝান বড় শক্ত ব্যাপার কারণ অনুরাগী

না হইলে সে স্বর্গীয় জিনিস বুঝিতে পারা যায় না কিন্তু তোমাকে একটু সহজ করিয়া বলিতেছি। বৎস! তুমি যদি কখন সংসারে কাহাকেও প্রকৃত রূপে ভাল বাসিয়া থাক অর্থাৎ এরূপ ভাব যদি কাহার জন্ত হইয়া থাকে যে ক্ষণ মাত্র না দেখিলে কষ্ট হয়, তাহার সুখেই সুখ, তাহার দুঃখেই দুঃখ, তাহারই চিন্তা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরূপ; তাহারই সুখের জন্য সর্ব্বদা উৎদ্যোগ, তাহারি বিচ্ছেদে প্রাণ ব্যাকুল, তাহা হইলেই অনুরাগের অর্থ বুঝিতে পারিবে।

বৎস! "আমি তোমার" অথবা "আমি তোমা ভিন্ন থাকিতে পারি না" ইহাই প্রকৃত অনুরাগ ইহাকেই সংসার সম্বন্ধে "ভালবাসা" এবং পরমার্থ পথে "ভক্তি" বলে। যিনি প্রকৃত অনুরাগী তিনি প্রিয় বস্তর তিলেক বিচ্ছেদে প্রাণান্ত বোধ করেন কারণ তিনি প্রকৃত সাধ্বী সতীর ন্যায় প্রিয়তম ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, কিন্তু যাহার অনুরাগ ভক্তি নাই তাহার প্রকৃতি কুলটা স্ত্রীর ন্যায় কপটতা পরিপূর্ণ এজন্ত প্রিয় বিচ্ছেদে কষ্ট মাত্র হয় না। যাঁহারা ভগবৎ বিচ্ছেদে ব্যাকুল হয়েন তাঁহারাই প্রকৃত অনুরাগী প্রকৃত ভক্ত এবং সেই বিচ্ছেদ অবস্থাতেই তাহাদের প্রাণের ভাব ও ব্যাকুলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

শিষ্য। প্রভো! কাহারও অনুরাগ হইয়াছে কি না এবং সে ব্যক্তি কপট কি না তা বুঝা যাইবে কি রূপে অর্থাৎ প্রকৃত অনুরাগী ভক্তের বিশেষ কি লক্ষণ আছে ?

গুরু। বৎস! সত্য জিনিস প্রকাশ হইতে বড় অধিক দেরি থাকে না—আন্তরিক ও মৌখিক দ্রব্যের প্রভেদ স্বর্গ, নরকের তুল্য তবে সহজে বুঝিবার জন্য একটা উপায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়—ভক্তের অন্তরে ভগবৎ চরণে এক প্রকার ঐশী বল উপস্থিত হয় যেন তাহাদের চরণের উপর বিশেষ দাবী দাওয়া দেখিতে পাওয়া যায়; যেন ভগবানের উপর তাহারা আশ্চর্য্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাখেন সেই জন্য ভগবানও তাহাদের আবদার না শুনিয়া থাকিতে পারেন না। অভক্ত অনুরাগ শূন্য লোকের মুখে কখন আবদারের কথা শুনিতে পাইবে না তিনি কখনই রামপ্রসাদের ন্যায় বলিতে পারিবেন না "এবার আমি বুঝব

হয়ে, মায়ের ধরব চরণ লব জোরে। ভোলানাথের ভুল ধরেছি বলব এবার যারে তারে—সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন বিচারে? পিতাপুত্রে এক ক্ষেত্রে দেখা মাত্র বলব তারে। ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ মিছে মরণ দেখায় কারে। মায়ের ধন সন্তানে পায় সে ধন নিলে কোন বিচারে, ভোলা, আপন ভাল চায় যদি সে চরণ ছেড়ে দিক আমারে"। বৎস! অধিক ভালবাসা, প্রণয় ও অনুরাগ না থাকিলে এরূপ অভিমানের কথা বলিবার সম্ভাবনা নাই ইহা ঠিক জানিবে। যিনি প্রকৃত ভক্ত অনুরাগী ও শরণাগত তিনি অভিমান করিয়া যাহা বলেন তাহা মিষ্ট লাগে এবং ভগবানও তাহা না শুনিয়া থাকিতে পারেন না ইহার দৃষ্টান্ত পরে ভক্তের চরিত্রে অনেক বলিব।

শিষ্য। ভক্তির আবদার কি ভগবান যথার্থই শুনেন?

গুরু। বৎস! পিতা মাতার উপর যেরূপ সন্তানের আবদার, প্রভুর নিকট যেরূপ ভৃত্যের আবদার স্বামীর নিকট যেরূপ ভার্য্যার আবদার সেই রূপ ভগবানের উপর ভক্তের আবদার জানিবে। তিনি চিরদিন ভক্তের আবদার শুনিয়াছেন, শুনিতেছেন ও শুনিবেন। একথার প্রমাণ ভক্তের চরিত্রে লক্ষ লক্ষ আছে এবং সেই জন্যই ভগবানের নাম ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় ভালবাসা ও অনুরাগ ছিল বলিয়া তাহারা কৃষ্ণের নিকট আবদার করিতে সক্ষম হইত। গোপিকাশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধিকার মানের কথা বোধ হয় সকলেই জানেন। রামপ্রসাদ ভগবানকে মাতৃভাবে ভজনা করিয়া পরম ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পদগুলিতে অনুরাগ ভক্তিতে পূর্ণ ও আবদারে মাখা মাখি। রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত পদটীতে যেন আবদার ভরা :—

"মা মা বলে আর ডাকব না, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী করিলে সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, মা বোলে আর কোলে যাব না।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে, মা মলে কি আর ছেলে বাঁচেনা।
ভনে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র, মা হবেন মা সন্তানের শত্রু,
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি, দিবি দিবি পুন জঠোর যন্ত্রণা।

বৎস! ভক্তের আবদার ভগবান চিরদিন শুনিয়া আসিতেছেন। তাহার দৃষ্টান্ত আর একটী দিতেছি। পরম ভক্ত বিদ্যাপতি মহাশয়ের কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। তিনি যে, একজন পরম ভক্ত ছিলেন এ কথা বলিবার আবশ্যক নাই কারণ তাঁহার কৃত পদাবলীই সে বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ। বিদ্যাপতি মহাশয়ের গঙ্গার উপর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, শুনা যায় তিনি গঙ্গাস্নান না করিয়া জলমাত্র গ্রহণ করিতেন না। অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে তিনি ব্যাকুল ভাবে পদব্রজে গঙ্গার নিকট গমন করিতেছিলেন ক্রমে শরীর অবসন্নপ্রায় হইয়া আসিলে ভক্ত বিদ্যাপতির মনে অভিমান হইল এবং তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন মা তুই কি এ সময় একবার তোর সন্তানকে দেখা দিবি না এই আমি পতিত রহিলাম দেখি তুই আসিস কি না এই বলিয়া বিদ্যাপতি পতিত রহিলেন। আহা! মাতঃ জগত জননী সন্তানের আবদার চিরদিন শুনিয়াছেন তিনি কি ভক্ত বিদ্যাপতির অন্তিম সময়ে আর দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন! তৎক্ষণাৎ কল কল ধ্বনিতে বিদ্যাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সন্তানকে বক্ষে করিয়া প্রস্থান করিলেন। অতএব বৎস! ভক্তের আবদার ভগবান চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছেন। ভক্তের যে ঐকান্তিক অনুরাগ হয় তাহাতে ভগবানকে স্বর্গধাম হইতে আকর্ষণ করে এবং ভগবান সেই আকর্ষণে অধীর হয়েন। তিনি বলেন " নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ, মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন যে বিচ্ছেদে যত ব্যাকুল হওয়া যায় ততই অনুরাগের বৃদ্ধি হয়, বিচ্ছেদ তবে কি এবং সে অবস্থায় কিরূপ ভাব হয়?

গুরু। বিচ্ছেদ অর্থে পৃথক হওয়া অর্থাৎ দুইটী প্রিয়ব্যক্তির পার্থক্য হওয়া। যাহার সহিত যাহার গাঢ় প্রণয় হয় তাহার দর্শন স্পর্শন ও সঙ্গ বড় মধুর বোধ হয় সেই প্রিয় জন দৃষ্টির অগোচর হইলে বা স্থানান্তরিত হইলে উভয়ের অন্তরে যে একপ্রকার ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশ হয় তাহাই বিচ্ছেদ নামে অভিহিত হয়। বিচ্ছেদাবস্থায় বোধ হয় যেন প্রিয়-

ব্যক্তি মন প্রাণ হরণ করিয়াছে—বল ও শক্তি হ্রাস করিয়াছে—উদ্যম উৎসাহকে নিরস্থ করিয়াছে, যেন মন তৃষিত চাতকের ন্যায় মিলনের জন্ত অস্থির যে অনুরাগের দ্বারায় উভয়ের হৃদয় বেগ উপস্থিত হইয়াছে উভয়ে প্রেমের ডোরে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা যেন বিচ্ছের সময়ে আরও অধিক প্রতীয়মান হয়। আবার যাই মিলন হয় অমনি যেন কোথা হইতে উৎসাহ, উদ্যম, আসিয়া নিস্তেজ দেহের শান্তি সঞ্চার করে, মান অভিমান আসিয়া গ্রাস করে। ভগবানের সহিত যিনি কোন রস বিশেষ দ্বারায় নৈকট্য সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারিয়াছেন তাহার পক্ষে ভগবৎ বিচ্ছেদ অনুভূত হয় অপ্রেমিক লোকের বিচ্ছেদে ও মিলন উভয়ই সমান। যাহারা সর্ব্বক্ষণ মানসে ভগবানের রূপ ধ্যান করেন তাহারা ক্ষণমাত্র সেরূপ না দেখিতে পাইলে ব্যাকুল হয়েন কিন্তু যাহারা সেরূপ কখন দেখে নাই বা চিন্তা করেন নাই তাহাদের পক্ষে বিচ্ছেদ স্বপ্নবৎ ও ব্যাকুলতাও অসম্ভব।

শিষ্য। প্রভো! ভক্তের যখন ভগবৎ বিচ্ছেদ উদয় হয় তখন কি রূপ অবস্থা হয় আমাকে বলুন?

গুরু। আমি এ সম্বন্ধে তোমাকে দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারায় বলিতেছি তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে।

বৎস! বিচ্ছেদে কিরূপ প্রাণ আকুল হয় এ কথার উল্লেখ হইলেই আমাদের শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবিচ্ছেদ মনে হয় ইহাই বিচ্ছেদের চরম আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে শ্রীরাধিকার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তাহার দশম দশা পাঠ করিলে প্রাণ ফাটিয়া যায় সে ভাব প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার। রাধিকার কৃষ্ণ প্রেম এতদূর গাঢ় ছিল যে তিনি তিলেকে প্রলয় দেখিতেন, ক্ষণমাত্র কৃষ্ণের অদর্শনে মৃতপ্রায় হইতেন। অধিককাল কৃষ্ণদর্শন না হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা হইত তাহা বর্ণনাতীত। বৎস! ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদে তিনি যে অবস্থায় পতিত হইতেন তাহার আভাষ কিঞ্চিৎমাত্র দিলেই বুঝিতে পারিবে। জয়দেব কৃত গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে যেরূপ লেখা আছে তাহা কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। এক জন সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার অবস্থা বলিতেছেন :—

নিন্দতি চন্দন মিন্দু কিরণ মনু বিন্দতি খেদ মধীরং।
ব্যাল নিলয় মিলনেন গরলমিব কলযতি মলয়সমীরং॥
সা বিরহে তব দীনা মাধব মনসিজবিশিখ ভযাদিব।
ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা॥
অবিরল নিপতিত মদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালং।
স্বহৃদয় মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজল নলিনী দল জালং॥
কুসুম বিশিখশরতল্প মনল্পবিলাসকলাকমনীয়ং।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভ সুখায় করোতি কুসুমশয়নীযং॥
বহতি চ বলিতবিলোচন জলধর মানন কমল মুদারং।
বিধুমিব বিকট বিধুন্তুদদন্ত দলন গলিতামৃতধারং॥
আবাসো বিপিনাযতে প্রিয় সখী মালাপি জালাযতে তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহন জ্বালাকলাপাযতে।
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্তহরিণী রূপাযতে হা কথং কন্দর্পোঽপি যমাযতে বিরচয়ঞ্ছার্দ্দুল বিক্রীড়িতং॥

হে মাধব, শ্রীরাধিকা তোমার বিরহে কাতর হইয়া নিরন্তর তোমারই চিন্তাতেই নিমগ্ন আছেন, যেন মনসিজের বাণভয়ে ধ্যানযোগে তোমাতেই লীন হইয়া আছেন। তিনি খেদে অধীর হইয়া চন্দন ও ইন্দু-কিরণের নিন্দা করিতেছেন। মলয় সমীরণ তাঁহার পক্ষে যেন বিষ বলিয়া বোধ হইতেছে, সর্পের আবাসস্থল চন্দন তরুর সংস্পর্শেই যেন উহা গরল হইয়াছে। হে মাধব! তুমি তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে বাস করিতেছ, আর মদন শর তদভিমুখে অনবরত পতিত হইতেছে, পাছে তোমার ব্যথা লাগে এই ভয়ে তিনি হৃদয়োপরি বিশাল বর্ম্ম স্বরূপ সজল নলিনী পত্র সমূহ ধারণ করিতেছেন। নানাবিধ বিলাস দ্রব্য সুশোভিত কমনীয় কুসুম শয্যা এক্ষণে তাহার পক্ষে শরশয্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমার আলিঙ্গন রূপ ফল লাভের জন্য ত কোন কঠোর ব্রত অবলম্বন করা চাই, তাই তিনি এই শরশয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। তাহার সুন্দর মুখকমলে অবিরল ধারে নয়ন জল প্রবাহিত হইতেছে, যেন রাহুর বিকট

দন্তাঘাতে চন্দ্রমণ্ডল হইতে অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে। হে মাধব, তোমার বিরহে এক্ষণে রাধার পক্ষে গৃহ অরণ্য তুল্য হইয়াছে, তিনি প্রিয় সখিগণকে বন্ধনপাশ বলিয়া মনে করিতেছেন। ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস পতিত হওয়ায় তাঁহার গাত্র সন্তাপ দাবানলের শিখাস্বরূপ হইয়াছে এবং তিনিও দাবানল দগ্ধ ও জাল পতিত হরিণীর ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিষ্ঠুর কন্দর্প শার্দ্দুলের ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতে তাহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে।

বৎস! আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি শ্রবণ কর—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সখ্যতায় এতদূর আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার রথের সারথি পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। উভয়ে একত্রে ভোজন একত্রে শয়ন একত্রে কথোপকথন এবং একত্রে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করায় তাহাদের মধ্যে ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদ হইত না। এইরূপে কালক্ষেপ করিয়া যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিলেন এই সময় অর্জ্জুন দ্বারকায় ছিলেন, হস্তিনায় প্রত্যাগমন কালে হরি বিরহে তাহার দেহমাত্র অবশিষ্ট রহিল তেজ বল উৎসাহ, বীরত্ব সকলি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গী হইয়াছিল। অর্জ্জুনকে এইরূপ দুরাবস্থাপন্ন দেখিয়া রাজা যুধীষ্ঠির দ্বারকার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন অর্জ্জুন কিছুকাল আতুরের ন্যায় ধর্ম্মরাজের পদ বন্দনাপূর্ব্বক অধমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার নয়ন কমল হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের মিত্রতা, সৌহার্দ্দ ও সারথ্য ক্রিয়া স্মরণ করিয়া একেবারে আকুল হইয়া পড়িলেন। পরে গদ্ গদ্ স্বরে অগ্রজ রাজাকে বলিয়াছিলেন—

শয্যা সনাটন বিকত্থন ভোজনাদি স্বৈক্যাদ্বয়স্য ঋতবানিতি বিপ্রলব্ধঃ সখ্যুঃ সখেব পিতৃবত্তনয়স্য সর্ব্বংসেহে মহান মহিতয়া কুমতেরঘংমে। সোহহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন সখ্যা প্রিয়েন সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ অধ্বন্যুরুক্রম পরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোঽস্মি॥ তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে সোহয়ং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি। সর্ব্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশ রিক্তং ভস্মন্ হুতং কুহকরাদ্ধ মিবোপ্ত মুর্ব্বাম্।

হে রাজন্ আমি সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আহা! সেই পুরুষের সহিত আমি একত্রে উপবেশন, একত্রে শয়ন, একত্রে ভ্রমণ, এবং একত্রে ভোজন করিতাম। ভ্রম ক্রমে যদি কোন অপরাধ করিতাম তিনি আমাকে নানাপ্রকার তিরস্কার বাক্যে বলিতেন সখে! তুমি না সত্যসন্ধ! আমার বহু অপরাধ হইলেও পিতার ন্যায় আমাকে ক্ষমা করিতেন। হে রাজন্! সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; সেই প্রিয়সখা ও প্রিয় সুহৃদ্‌বিরহে একেবারে শূন্যহৃদয় হইয়াছি। বিশেষতঃ এতদূর বলহীন হইয়াছি যে পথিমধ্যে নীচ গোপজাতি আমাকে পরাজিয় করিয়া আমার সমভিব্যাহারিণী মাধবের অনাথা ষোড়স সহস্র কামিনীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল আমি রক্ষা করিতে পারিলাম না। হে নৃপেন্দ্র! সেই ধনুক সেই রথ সেই শর সেই অশ্বাদি এবং আমিও সেই নৃপবিজয়ী ধনঞ্জয় বর্ত্তমান রহিয়াছি কিন্তু হায়! কৃষ্ণ বিরহে এতদূর প্রভাব শূন্য হইয়াছি যে, মন্ত্রাদিলব্ধ উপায় সমূহ ইন্দ্রজালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

অর্জ্জুন সেই বিচ্ছেদাবস্থায় হরিবিরহে কাতর হইয়া আরও যে সকল মর্ম্মবিদারক কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়—অর্জ্জুন বলিলেন হে মহারাজ! আমার যে তেজঃপ্রভা দেখিয়া দেবগণও বিস্মিত হইতেন, আজ আমি বন্ধুরূপী হরি হইতে বঞ্চিত হইয়া সেই প্রভা হারাইয়াছি। আমি যাঁহার প্রভাবে একাকী একদিন ত্রিভুবন জয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই পুরুষের বিচ্ছেদে সমুদয় শূন্য বোধ করিতেছি। আমি কৃষ্ণ বিচ্ছেদে মৃতপ্রায় হইয়াছি।

বৎস! গোপীকা শ্রেষ্ঠ রাধিকার ও কৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনের বিচ্ছেদের কথা যাহা বলিলাম ইহা মানব জীবনে অতীব দুর্লভ। সাধক যে পরিমাণে ঈশ্বর বিচ্ছেদ অনুভব করেন সেই পরিমাণে শান্তিসুখের অধিকারী হন।

শিষ্য। প্রভো! বিচ্ছেদের অবস্থাতো অতি দুঃখের অবস্থা, সে

অবস্থা কিরূপে প্রিয় বস্তুর উপর প্রীতি বৃদ্ধি করে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। বৎস! বিচ্ছেদ হইলে প্রিয় দর্শনার্থ এবং পুনঃ মিলনার্থ একপ্রকার ঐকান্তিক ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। সেই ব্যাকুলতার সঙ্গে সঙ্গে মনে শাস্ত্বনার ও প্রীতিরসের উদয় হয়। বস্তুতঃ গাঢ় ভালবাসার পুষ্টি বিচ্ছেদ রসের দ্বারাই সাধন হয়। যেখানে বিশেষ প্রণয় ও ভালবাসা সেইখানেই বিচ্ছেদ ঘটে এবং বিচ্ছেদসহ অভিমানের উদয় হয়। বিচ্ছেদ হইলে যাহার সহিত যাহার মনে অনুরাগ আছে তাহা আরও অধিক হয়। বৎস! শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রেম জগতে আদর্শ স্বরূপ, যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছিলেন তখন শ্রীরাধিকার যে বিচ্ছেদ হইয়াছিল তাহা অনির্ব্বচনীয়। সেই বিচ্ছেদের অবস্থায় যদিও শ্রীরাধিকা নিদারুণ বিরহ ব্যথায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের মধুরতা তিনি আরও অধিক আস্বাদন করিয়াছিলেন। বৎস! যেরূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিত না হইলে সুশীতল মলয় হিল্লোলের মূল্য বুঝিতে পারা যায় না, অতিরিক্ত ক্ষুধায় প্রপীড়িত না হইলে যেরূপ কেহই অন্নের আদর বুঝিতে পারে না, সেইরূপ প্রিয় বিচ্ছেদ উপস্থিত না হইলে প্রিয় ব্যক্তির যে কত মূল্য তাহা বুঝা যায় না। বৎস, ভগবৎ প্রেমের যে বিচ্ছেদ তাহা দুঃখের অবস্থা নহে—তাহারও মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে যাহা ভগবৎপ্রাপ্তি ভিন্ন অনুভব করা যায় না। সেই জন্যই কেহ কেহ বলেন যে ভগবৎ বিচ্ছেদই তৎপ্রীতি।

বৎস! যাহার সহিত যাহার অনুরাগ হয় লক্ষ যোজন দূরে থাকিলেও অনুরাগের হ্রাস হয় না। লৌহ চুম্বকের যেরূপ সম্বন্ধ, অনুরাগীর অন্তরও প্রিয়বস্তুর মধ্যে ঠিক সেইরূপ। জগৎ স্রষ্টা এই স্বর্গীয় অনুরাগের আদর্শ স্বরূপ কতকলি বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। "গিরৌ কলাপী গগণে পয়োদো লক্ষান্তরে হর্কশ্চ জলেষু পদ্মঃ। ইন্দু দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধুর্যের্যস্ত হৃদ্যো নহিতস্তদ্দুর॥ অর্থাৎ পর্ব্বতে ময়ুর, আকাশে মেঘ, লক্ষ যোজন অন্তরে সূর্য্য, জলে পদ্ম, দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে চন্দ্র কুমুদের বন্ধু

অতএব যে ব্যক্তি যাহার প্রিয় সে কখনই তাহার দূরবর্ত্তী নহে। ভক্তবৎসল হরির সহিত যখন ভক্তের এইরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ হয় তখন ভক্তের হৃদয়োচ্ছাস পূত সলিলা জাহ্নবীর ন্যায় তর তর বেগে ভগবানের অনন্ত প্রেম সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। ভক্ত যে অবস্থার যে স্থানেই থাকুন না কেন তাহার মন লৌহ সূচীকার ন্যায় চুম্বক প্রস্তরের স্বরূপ ভগবানের দিকেই থাকে অন্যদিকে গতি হয় না। অতুল সুখ সম্পদের মধ্যে থাকিয়াও ভক্ত সর্ব্বক্ষণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল, ভগবানই তাঁহার লক্ষ্য। স্ত্রী পুত্রের প্রণয়, ধন-সম্পত্তির আশক্তি, গুরুজনের আজ্ঞা ও আহার বিহার সুখ সম্ভোগ, ভক্তের নিকট ঘৃণিত, তিনি তখন সর্ব্বদা ভগবৎ প্রেমসাগরে ডুবিয়া প্রাণ শীতল করেন। অতএব বৎস ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে যে তুমি প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহার স্থূল ভাব এই জানিয়া রাখ যে, সাধকের যখন ভগবানের উপর প্রগাঢ় অনুরাগ হয় তখনি ভক্তির ভাব প্রকাশ হইয়াছে। এই অনুরাগের লক্ষণ কিরূপ তাহা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন একটী ভক্তের চরিত্র দ্বারা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

---o---

রঘুনাথ দাসের জীবন বৃত্তান্ত।

পরমভক্ত রঘুনাথ সপ্তগ্রাম বাসী প্রসিদ্ধ ধনী ও বদান্য গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র। ইনি অতি বাল্যকাল হইতেই বিশেষ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন; তাঁহার ন্যায় প্রগাঢ় অনুরাগ ও ব্যাকুলতা প্রায় সহসা কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাগ্যক্রমে তাঁহার অন্তরে ভগবৎপ্রেম এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তিনি সর্ব্বদাই উ... প্রায় থাকিতেন এবং সর্ব্বক্ষণ গৃহ ভবন পরিত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ হইবার চেষ্টা করিতেন। ইনি যতবার পলায়ন করিতেন তাঁহার পিতা ততবার তাহাকে ধরিয়া আনিতেন এবং নানাবিধ ধন রত্নাদি ও অতুল বৈভবাদি দ্বারা তাঁহার চিত্তকে হরণ করিতে যত্ন করিতেন কিন্তু ভগবৎ ভক্তের মনকে ভুলায় কে, যাঁহাদিগের মন সংসারের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া একবার হরিপ্রেমে মজিয়াছে তাঁহাদিগকে কি সামান্য সংসারের সুখে ভুলাইতে পারে? তাঁহার একান্ত অনুরাগ সেই হরি পদারবিন্দে, তিনি কি আর ঘৃণিত বিষয় ভোগে মোহিত হইতে পারেন! রঘুনাথের সরস বৈরাগ্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়। কিছু দিবস পর্য্যন্ত তিনি নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন কারণ বৃদ্ধ পিতা তাঁহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতেন না। পাছে সন্তান পলায়ন করে এজন্য পিতা ১০ | ১২ জন প্রহরী তাহার নিকট সর্ব্বদাই রাখিতেন। রঘুনাথের মাতা রঘুনাথের প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিলেন বোধ হয় পুত্র উন্মাদ হইয়াছে অতএব উহাকে দড়ি দিয়া বন্ধন কর নতুবা উহাকে রাখা দুষ্কর হইবে। গোবর্দ্ধন স্ত্রীর কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য, অপ্সরা তুল্য স্ত্রী যাহাকে বাঁধিতে পারিল না তাহাকে কি সামান্য রজ্জু দ্বারায় বাঁধা যায়! ইহার উপর ভগবানের সম্পূর্ণ কৃপা হইয়াছে অতএব ইহাকে রাখা অসম্ভব। রঘুনাথ প্রহরী দ্বারা সর্ব্বদা বেষ্টিত থাকায় বহুদিন পর্য্যন্ত পলায়নের সুযোগ পান নাই পরে একদিন সুযোগ পাইয়া বনে বনে নীলাচল পলায়ন করিলেন। গোব-

র্দ্ধন দাস পুত্রকে ফিরাইবার জন্য অনেক স্থানে পত্রাদি ও লোক জন পাঠাইলেন কিন্তু রঘুনাথ যে পথ ধরিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন তথায় লোকজনের গতিবিধি ছিল না। বন, নদী, পর্ব্বত, অতিক্রম পূর্ব্বক অতি কষ্টে অনাহারে রঘুনাথ বার দিবসের পর নীলাচলে উপস্থিত হইয়া পরম প্রেমিক ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। গৌরাঙ্গ রঘুনাথকে পাইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন এবং আলিঙ্গন করিবার জন্য পদপ্রান্ত হইতে উঠাইলেন। কিন্তু রঘুনাথ দূরে প্রস্থান করিয়া বলিলেন প্রভু আমি অতি পাপি আমার দেহ আপনি স্পর্শ করিবেন না। গৌরাঙ্গ কহিলেন রঘুনাথ! আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া অদ্য কৃতার্থ হইব। এই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলে রঘুনাথ অতি কাতর ও দীন ভাবে চৈতন্তের পদে পতিত হইয়া বলিলেন প্রভু! আমি আপনার শ্রীপদে পতিত রহিলাম কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন। আহা! এরূপ দীনভাবাপন্ন না হইলে কি আর ভক্তিরূপ অমূল্যধন লাভ হয়, দীনতাই ভক্তের ভূষণ যে, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোবিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মান দেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥

রঘুনাথের নিরতিশয় দীনতা দেখিয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অনুচরবর্গকে ও নিকটস্থ অপরাপর লোককে সম্বোধন করত বলিলেন আহা! দয়াময় হরির যাহার উপর কৃপা হয় তাহার আর সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ইহার পিতা একজন ঘোর সংসারী বিষয়ের কীট! কিন্তু হরি কৃপায় ইনি বিষয় হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন। রঘুনাথকে অনাহারে অতিশয় কৃশ ও মলিন ছিন্ন বস্ত্র পরিধেয় দেখিয়া প্রভু নিজ ভৃত্য ও অনুচরবর্গকে বলিলেন অদ্য তোমাদিগের হস্তে আমি রঘুনাথকে সমর্পণ করিলাম। ভৃত্য ও অনুচরবর্গ সকলেই পরম ভক্ত রঘুনাথের সেবা করিবেন বলিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। এবং সকলেই মহা আগ্রহের সহিত পরমভক্ত রঘুনাথ দাসের সেবায় যত্নবান হইলেন। কিন্তু রঘুনাথের সেবা করে কে? যখন ভৃত্যগণ তাহার সেবা

শুশ্রূষা করিতে যাইলেই তিনি দৌড়িয়া প্রস্থান যাইতেন। পাছে সাধু ভক্তের সেবা গ্রহণ করিতে হয় এজন্য তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অজ্ঞাতসারে শ্রীমন্দিরের সিংহ দ্বারে যাইয়া কাঙ্গাল গরিবদিগের সহিত প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া কোনরূপে জীবন যাপন করিতেন। কিছু দিবস পরে তাহাও ভাল লাগিল না। তিনি খুজিয়া খুজিয়া একটী অনায়াস বৃত্তি অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ শ্রীমন্দিরে যে সকল গাভী ছিল তাহাদিগের মুখ ভ্রষ্ট পরিত্যক্ত পর্য্যুষিত অন্ন সংগ্রহপূর্ব্বক ধৌত করিয়া তাহাই পরমানন্দে আহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিবস অতীত হইলে একদিন রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গকে অতি বিনীত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। চৈতন্য বলিলেন তুমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া ভক্তিসহকারে রাধাকৃষ্ণের সেবা ও নাম সংকীর্ত্তন কর। শ্রীগৌরাঙ্গের এই উপদেশ মতে রঘুনাথ নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিলেন এবং তথায় অবশিষ্ট জীবন কেবল নাম জপ ও সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিলেন। বৈরাগী হইয়া পর্য্যন্ত তিনি এক দিনের জন্য ভাল দ্রব্য রসনায় স্পর্শ করেন নাই।

আমরা রঘুনাথের চরিত্রে আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি—যেরূপ দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের সূচীকা বারম্বার ঘুরাইলেও উত্তর দিকেই ধাবিত হয় সেইরূপ রঘুনাথের মন নানাপ্রকার প্রলোভন অতিক্রম করত এক ভগবানের পদারবৃন্দে ধাবিত হইয়াছিল। তিনি পিতা মাতার অতি আদরের সন্তান ছিলেন। বিপুল সম্পত্তি ও পরমা সুন্দরী সুশীলা স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াও রঘুনাথ তাহাতে মুগ্ধ হন নাই। তিনি ভক্তিপথের একজন প্রধান আদর্শ হইয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপি এক জন গুরু বলিয়া পরিচিত। যে ছয়জন গোস্বামী সাধন বলে সর্ব্বত্র পূজনীয় হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে ইনি এক জন সর্ব্বপ্রধান অতএব ভক্তি পথাবলম্বীদিগের জীবন পাঠ করা যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এ কথা আর বলিবার আবশ্যক নাই। বৎস! ভগবানের উপর দৃঢ় অনুরাগ হইলে যে মদ্যপায়ী মাতালের ন্যায় গতি হয় বলিয়াছি তাহা রঘুনাথের জীবনচরিত্রেই বিস্তারিত রূপে প্রমাণিত হয়।

ভক্তিভাব ও পঞ্চরসের নির্ণয়।

ঐকান্ত ভাবো গীতার্থ প্রত্যভি জ্ঞানাৎ ।

শিষ্য। প্রভো! আপনি ভক্তিরস্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ কালীন বলিয়াছেন যে, ভগবানের উপর যে প্রগাঢ় অনুরাগ তাহাই ভক্তি কিন্তু অনুরাগের উৎপত্তি কিরূপে হয় বলুন।

গুরু! বৎস! ভাবের গাঢ়তা জন্মিলেই অনুরাগ হয়।

শিষ্য। প্রভো! ভাব কাহাকে বলে।

গুরু। ভাব অর্থে মনের বিকার বা কল্পনা বিশেষ। যাহার যেরূপ প্রকৃতি তাহার সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে এবং পুরুষের গুণানুরূপ ফল সংকল্প ভেদে এই ভাবের আবার ভেদ আছে। হিংসা অথবা দম্ভ কিম্বা মাৎসর্য্য করিয়া ক্রোধী পুরুষের ভেদ দর্শন পূর্ব্বক যে সকল ভাব উদয় হয় তাহা তামস; ভগবান ব্যতিরিক্ত অন্য দ্রব্যে স্পৃহা অথবা ঐশ্বর্য্য অভিসন্ধি করিয়া ভেদ দর্শনপূর্ব্বক যে ভাব হয় তাহা রাজস; আবার ভগবানে অকর্ম্মফল সমর্পন করতঃ ভেদ দর্শনপূর্ব্বক যে ভাবের উদ্দীপনা হয় তাহা সাত্বিক। ভগবদ্ভাব সম্বন্ধে "ভক্তি রসামৃত সিন্ধু" বলেন যে, "শুদ্ধ বিশেষাত্মা সূর্য্যাংশু সাম্যভাক রুচিভিশ্চিত্ত মাসৃণ্য কৃদসৌ ভাব উচ্যতে।" অর্থাৎ ভাব প্রেম সূর্য্যের কিরণ সদৃশ ইহাতে ইষ্ট বিষয়ে রুচি হয় এবং সেই রুচি দ্বারায় চিত্ত নির্ম্মল হয়। বৎস! ভাবোদয় হইলে অভীষ্ট দেবতাকে লাভ করিবার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠা জন্মে এবং ব্যাকুলতা হয়।

বৎস! ভগবৎ গুণ শ্রবণমাত্র সমুদ্রগামী গঙ্গা সলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ফলানুসন্ধান রহিতা এবং ভেদ দর্শন বর্জ্জিতা হইয়া মনের যে প্রবল গতি হয় তাহাকেই নির্গুণ ভক্তিভাব কহে। ঐ প্রকার ভাবকেই আত্যন্তিক বলা যায় উহা হইতে পরম পুরুষার্থ আর নাই।

বৎস! স্বভাবতঃ ভাবের গতিবিধি বড় আশ্চর্য্য, ইহা কিসে হয়

কিসে যায়, কোথা হইতে আসে কোথায় যায় স্থির করা বড় কঠিন ব্যাপার। বায়ু যেরূপ কোন্ স্থান হইতে আসে, কোথায় যায় নিশ্চয় হয় না, কর্পূর যেরূপ দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির অগোচর হয় ভাবের গতিও ঠিক সেইরূপ ইহা কখন আসে কখন যায়, কিসে উৎপত্তি হয় কিসে নিবৃত্তি হয় নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। ভক্তগণ এই দুর্লভ ভাবের জন্য সর্ব্বদাই অনুসন্ধানপর হইয়া থাকেন। বৎস! কত দিন এই মনো মুগ্ধকরী ভাব হৃদয়ে ক্ষণমাত্র প্রকাশিত হইয়া কত ভাবুক ভক্তকে কতপ্রকার ভাবাবেশে বিহ্বল করিয়াছে নরকান্ধকারে স্বর্গের জ্যোতি দেখাইয়াছে, আবেশে গদ্ গদ্ করিয়া প্রেমে উন্মত্ত করিয়া প্রস্থান করিয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। কত দিন কত ভক্ত ইহাকে সরোবরে, প্রান্তরে, বৃক্ষতলে, পর্ব্বত শৃঙ্গে অনুসন্ধান করিয়াছে কিন্তু ইহার তত্ত্ব পায় নাই এবং আর পাইবে না বলিয়াই হতাশ হইয়াছে, কিন্তু হয়ত পুস্তক খুলিয়া একটী রসপূর্ণ ছত্র যাই পাঠ করিয়াছে বা কোন নির্জ্জন কাননে যাই একটী বিহঙ্গের সুমধুর গীত শুনিয়াছে, বা স্বভাবের কোন সুন্দর ছবি দর্শন করিয়াছে অমনি সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব আসিয়া আবর তাহাদের নাচাইয়া কাঁদাইয়া হাঁসাইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে আবার বিস্তর যত্নেও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তাই বলি আশ্চর্য্য ইহার গতি আশ্চর্য্য ইহাই বিধি!

শিষ্য। প্রভো! আপনি ভাবের বিষয় যেরূপ বলিলেন বোধ হয় ইহা পোষণ করা অতি কঠিন ব্যাপার ও কষ্টজনক।

গুরু। বৎস! যখন ক্ষণমাত্র ভাবোদয়ে পরমানন্দ উপভোগ করা যায় এবং ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদে যে কষ্ট ও ব্যাকুলতা হয় তাহার দ্বিগুণতর আনন্দ ক্ষণমাত্র লাভ হইলে উদয় হয় তখন ভাব পোষণ বিশেষ কষ্টকর বলিতে পারি না। বিশেষতঃ যিনি এ সম্বন্ধে গুরুর উপদেশ লাভ না করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে ভাব পোষণ বিশেষ কষ্টকর হয় নতুবা ইহা অতি আনন্দপ্রদ।

শিষ্য। প্রভো! যে উপদেশের দ্বারায় ভাবাবেশ হয় তাহা আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বলুন।

গুরু। বৎস! ভগবান রসবিশেষের বশীভূত এবং রস ব্যতীত তাঁহাকে জানা না জানা সমান। এই রস পঞ্চপ্রকার যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পঞ্চরসের কোন একটী রসকে আশ্রয় করতঃ ভগবানকে ভজনা করিলে হৃদয়ে ভগবৎ ভাবোদয় সহজে হয়।

শিষ্য। প্রভো! পঞ্চরসের সহিত ভাবের কিরূপ সম্বন্ধ?

গুরু। বৎস! পঞ্চরসের সহিত ভাবের বড় নৈকট্য সম্বন্ধ। জগতে সচরাচর দেখা যায় যাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে মানব তাহারই ভাবনা করিয়া থাকে কিন্তু যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই কোন রকম পরিচয় নাই তাহার কোন ভাবনাই হয় না। পিতামাতার জন্য বন্ধু-বান্ধবের জন্য স্ত্রী পুত্রের জন্য এবং অনুগত ভৃত্যের জন্য সকলেরই মন ব্যাকুল হয় কিন্তু অপরিচিত লোকের জন্য মন আকুল হয় না ইহার কারণ কেবল ভাবের অভাবই জানিবে। শান্ত দাস্য, বাৎসল্য প্রভৃতি যে রসের কথা বলিয়াছি সেই গুলিই ভাবোদ্দীপক সেই জন্য উহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! বৎস! নীরস চিন্তায় ভাবাবেশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

শিষ্য। প্রভো! আপনার এ উপদেশটী এখনও ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। সংসারে একত্রে বাস করাতে এবং মায়া মমতায় আবদ্ধ হওয়াতে পরস্পরের ভাবনা চিন্তা হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে অর্থাৎ যাঁহাকে কখন দেখিলাম না যাঁহার কোন পরিচয় পাইলাম না তাঁহার বিষয় ভাবনা হইবার কিরূপ সম্ভাবনা?

গুরু। বৎস! ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য এবং তাঁহার পরিচয় বিশেষরূপে দিবার জন্য জগতই আমাদের শিক্ষার স্থান এবং পরীক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র। গৃহধর্ম্ম সমস্তই ভগবানের প্রিয় নিকেতন ও তাঁহার আনন্দোৎসব ক্ষেত্র সেই জন্য কবি বলিয়াছেন :—" গৃহ ধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন, পবিত্র তীর্থ এ সংসার তপোবন, আনন্দোৎসবপূর্ণ এ সংসার ভবন, প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।" এই সংসারের যাবতীয় সম্বন্ধ পরিণামে ভগবানে নিয়োজিত হইলেই জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কারণ এ

জগতে মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আমরা যাহা লইয়া ভুলিয়া আছি তাহা সকলি নশ্বর ব্যাপার কিন্তু সেই মায়া মমতা অনুরাগ যখন ঈশ্বরে ন্যস্ত হয় তখনি উহা গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করে। বৎস! ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া মনের স্বাভাবিক বৃত্তি তবে মানবের মন সর্ব্বদা বিষয় কামনায় জড়ীভূত থাকায় এবং ঘোর মায়ায় আবদ্ধ থাকায় সে স্বাভাবিক বৃত্তি বড় প্রকাশ পায় না কিন্তু যে পরিমাণে মায়ামমতা বিষয় কামনা কমিতে থাকে সেই পরিমাণে ইহা প্রকাশ হয়। যদিও পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্রের স্নেহে মানব সতত ভুলিয়া থাকে কিন্তু ঈশ্বরের স্বাভাবিক নিয়মের গতিরোধ করে কার সাধ্য জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে সেই দিকেই দেখিবে সমগ্র স্বভাব অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই স্বাভাবিক নিয়মের অধীন হইতে বলিতেছে জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে বলিতেছে। সংসারের চতুর্দ্দিগেই মৃত্যু করাল মুখব্যাদন করতঃ বলিতেছে জীব সংসারে ভুলিও না স্ত্রী পুত্রের মায়ায় মজিও না হরি প্রেমে মজ, তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব কর। নির্দ্দয় কঠোর ত্রিতাপ মর্ম্মভেদী রবে ঘোষণা করিতেছে মানব আর মোহ মায়ায় নিদ্রা যাইও না, আর সময় নাই শীঘ্র ভগবানের শরণাগত হও তাঁহাকে ভক্তিসহকারে পূজা কর। এইরূপ স্বভাবের সর্ব্ববিষয়ই শিক্ষা দিতেছে যে, ভগবান ভিন্ন আর বন্ধু নাই, তিনিই পিতা মাতা সুহৃদ ও সহায় তিনি সর্ব্বসম্পত্তির ও সর্ব্বসুখের আকর।

বৎস! ভগবানই যে প্রকৃত পিতা মাতা ধাতা ইহা তিনি নিজেই গীতায় বলিয়াছেন; পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্র মোঙ্কারো ঋক্ সাম যজুর্ব্বেচ॥ গতি ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং॥ অর্থাৎ আমি এই জগতের পিতা মাতা ও বিধাতা, আমি বেদ্য এবং পবিত্র এবং আমি ওঁকার ও ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ স্বরূপ। আমিই গতি, আমিই ভর্ত্তা, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষী আমিই নিবাসস্থান, আমিই রক্ষক, আমিই সুহৃদ, আমিই প্রভব, আমিই প্রলয়স্থান, আমিই নিধান এবং আমিই অবিনাশী বীজস্বরূপ। অতএব বৎস! ভগবান আপনাকে জানাইবার

জন্যই যাবতীয় পদার্থকে অস্থায়ী করিয়াছেন। তিনি কৌশলে সকল পদার্থের মধ্য হইতে আপনার পরিচয় দিতেছেন।

যিনি ভাগ্যক্রমে এই গুঢ় রহস্য বুঝিতে পারেন তিনিই সংসারের অতীত, তিনিই ভাবুক ও ভক্ত। সেরূপ লোক ঈশ্বরকে কখন পিতা মাতা বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়েন আবার কখন স্বামী বলিয়া আনন্দরসে নিমগ্ন হয়েন আবার কখন বা তাঁহাকে সর্ব্বসম্পত্তির ও সকল ধনের অধিকারী ভাবিয়া প্রেমে বিহ্বল হয়েন। বৎস! মানব সাধারণতঃ যেসকল বিষয়ে রস বোধ করে তাহা সে অবস্থাতে অতি নীরস বোধ হয় কারণ ভগবৎ সম্বন্ধীয় রসই তখন তাঁহার পরম পরিতৃপ্তিকর বোধ হয়।

শিষ্য। প্রভো! আপনি সংসারের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলেন ইহা অতীব আনন্দকর কিন্তু পঞ্চরসের বিষয় যাহা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এখনও ভালরূপ বোধগম্য হয় নাই অতএব এক একটী বিষয় পৃথক করিয়া আমাকে বলুন।

গুরু। বৎস! (১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুর ইহারাই পঞ্চরস নামে অভিহিত হয়। (১) শান্ত রসটীই জীবের সংসার গতিনিবৃত্ত্যনন্তর পরব্রহ্মে অবস্থান করায়। সনকাদি ঋষিগণ এই রসের সাধক। দাস্য রসই দ্বিতীয়, ইহাতে একটু মমতা উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ ভগবান আমার প্রভু এবং আমি তাঁহার দাস এরূপ একটী সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। এই দাস্য রস শান্তরস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ ইহাতে শান্তরসের সম্পদ আছে তা ছাড়া ভগবানের সহিত একটা মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত করে। (৩) সখ্যরসই তৃতীয়, ইহাতে ভগবানের সহিত বন্ধুত্বের ভাব উদয় হয় অর্থাৎ সংসারের সকল প্রকার বন্ধুত্ব ছাড়িয়া ভগবানকেই পরমবন্ধু বলিয়া মনে হয়, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত দুইটী রসের সম্পর্ক আছে। (৪) বাৎসল্য রসই চতুর্থ রস ইহাতে ভগবানের সহিত পিতা পুত্রের যে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ তাহাই স্থাপিত করে। ইহাতে পূর্ব্ব কথিত তিনটী রসের সম্পদ আছে (৫) মধুর রসটি পঞ্চম রস ইহাই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ও পরম পবিত্র। ইহাতে সতীস্ত্রীর স্বামীর উপর যেরূপ

অনুরাগ হয় সেইরূপ ভগবানের প্রতি হয়। ইহাতে পূর্ব্ব কথিত রস চতুষ্টয়ের সমস্ত সম্পদ আছে এবং পতি ও স্ত্রীতে যেরূপ কোন বিষয় গোপন থাকে না সেইরূপ সরল পবিত্রপ্রেম ভগবানের সহিত স্থাপিত করে। এই পঞ্চরসের কোন একটি রস ভিন্ন ভগবানকে ভাবনা করা না করা সমান। যিনি নিরন্তর ভগবৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত রসের কোন একটী রস লইয়া ভজনা করেন তাহার হৃদয়ে ভাবরূপা ভক্তির স্ফূর্ত্তি আপনা হইতেই হইয়া থাকে এবং সাধ্যরূপা ভক্তি লাভ করিবার পথ পরিষ্কৃত হয়। বৎস! সংক্ষেপতঃ সহজ কথায় তোমার ইহাই জানা উচিত যে,সংসারে যাহা কিছু করিবে তাহা ভগবানকে উদ্দেশ্য না করিয়া করিবে না। সর্ব্বদাই ইহা মনে রাখিবে যে, ভগবানকে লইয়া তুমি আছ, তিনিই তোমার অবলম্বন তিনিই তোমার চিন্তার বিষয় এবং তাঁহার সহিত তোমার নৈকট্য সম্বন্ধ। সমস্ত আচার, ব্যবহার, কাম, ক্রোধ, অভিমান সকলি তাঁহার উপর করিবে। কখন অভিমানে বলিবে আমার পিতার ন্যায় বা স্বামীর ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্য আর কাহার নাই কখন ভাবিবে আমার প্রাণেশ্বরের ন্যায় সুন্দর পুরুষ আর কে আছে আবার কখন ভাবে আপ্লুত হইয়া ভাবিবে ভগবানই একমাত্র পতিত পাবন দীন হীনের বন্ধু। বৎস! এইরূপ ভাবাবেশ হইয়া ভাবুক ভক্তগণ সংসার ভুলিয়া ভগবৎ প্রেমে তন্ময় হয়েন। নারদ সেইজন্য বলিয়াছেন :— ওঁ তদর্পিতা শীলা রস্মচ কাম ক্রোধাভিমানদিক স্তস্মিনেব করণীয়ং" অর্থাৎ যদি কাম ক্রোধাদি করিতে হয় তাহা হইলে ভগবানের উপর করাই কর্ত্তব্য।

শিষ্য। প্রভো! যে ভাবের কথা আপনি বলিতেছেন ইহাকে কেহ কেহ কল্পনা মূলক বলিয়া থাকে এবং ইহার বিচিত্র ভাব সকলেরই হৃদয়ে যখন স্বীয় স্বীয় স্বাভাবিক গুণানুসারে নানারূপে পূর্ণ আছে তখন একটু সাদৃশ্য দৃষ্টান্ত ও সম্বন্ধাধীন ঘটনা বা প্রসঙ্গ হইলেই ত মনোভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। সচরাচর দেখা যায় যে, একজন কোন কথা শুনিতে শুনিতে ক্রন্দন করিয়া ফেলিল আবার সেই লোক পরক্ষণেই আর একটী প্রসঙ্গ শুনিয়া হাঁসিয়া ঢলিয়া পড়িল। এই যে বিপ-

রীত মনোভাব ইহা পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে। কেহ হয়ত একটি কথা শু-নিয়া ভগবানের বিচ্ছেদে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিল, আবার কেহ হয়ত সেই কথা শুনিয়া পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিল। যখন অন্তঃ-করণের প্রকৃত ভাব জানা যায় না কেবল বাহ্যভাব দেখিয়া বিচার করিতে হয় তখন কয়টী ভক্তিভাব কিসে জানা যায়।

গুরু। তোমার এ প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত, আমি যথাযথ ইহার প্রত্যুত্তর দিতেছি।

বৎস! ভাব, ভক্তি রাজ্যের অমূল্য ধন ইহাকে জ্ঞানান্ধগণ মায়িক বা কল্পনামূলক বলিতে পারেন কিন্তু ভক্তের ইহা প্রাণ সরূপ। ভাব ভিন্ন সকলেরই শূন্য হৃদয়; যাহার মনে ভাবাবেশ হয় সেই আনন্দরসে ভাসিতে থাকে এবং পুলকাশ্রু সহ ভাবে বিহ্বল হয়। সাত্বিক বিষয়ের আলোচনায় সাত্বিক ভাবের উদয় হয় ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি শ্রবণ কর। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ দাক্ষিণত্য প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন তথায় বঙ্কভট্ট নামে একজন ভক্তিপথাবলম্বী বিপ্র তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক নিজ গৃহে আহ্বান করেন। গৌরাঙ্গকে চাতু-র্মাসের অনুরোধে চারিমাস কাল তথায় তবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। সেই স্থানে একজন জ্ঞানহীন ভক্ত ব্রাহ্মণ প্রত্যহ অতি ভক্তিসহকারে গীতা পাঠ করিতেন এবং পাঠকালে তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা নির্গত হ-ইত। জ্ঞানান্ধ পণ্ডিতগণ বিপ্রের ব্যাকরণ শুদ্ধি না থাকাতে অশ্রদ্ধা করিত কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণ কর্ণপাত না করিয়া ভক্তিসহ প্রত্যহই গীতা পাঠ করিত। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ সেই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিনয় বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় কোন্ অর্থ পড়িয়া আপনার এত অশ্রুপাত হয়? বিপ্র বলিল আমি অর্থাদি কিছু বুঝি না, গুরু আজ্ঞায় গীতা পাঠ করিয়া থাকি মাত্র, কিন্তু পাঠ করিতে বসিলেই অর্জ্জুনের রথে বসিয়া ভগবান তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন এই অপরূপ ভাব হৃদয়ে উদয় হয় এবং সেই মনোহর দৃশ্য আমি চক্ষে দর্শন করিয়া থাকি। মহাশয়! যতক্ষণ পাঠ করি ততক্ষণ সেইরূপ দেখিতে পাই এইজন্য আমার মন ব্যাকুল হয় এবং গীতাপাঠ

ছাড়িতে চাহে না। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন প্রেমালিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন মহাশয় আপনিই যথার্থ গীতা পাঠ করেন এবং আপনিই ইহার সার অর্থ বুঝিয়াছেন। বৎস! এইটী সাত্ত্বিক ভাব জানিবে এই ভাব যতদূর পোষণ করিতে পারা যায় ততই ভক্তির গাঢ়তা হয়। এখন সাত্ত্বিক বিষয় শ্রবণ করিতে করিতে তামসিকভাব কিরূপ উদয় হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। একটী স্থানে প্রত্যহ বৈকালে চণ্ডীর গান হয়। একটি স্ত্রীলোক নিয়মিতরূপে তথায় গান শুনিতে যাইয়াচক্ষের জলে ধরা অভিষিক্ত করিত। সকল লোকের মনে এই ধারণা হইল যে এ লোকটীর মত ভাবুক ভক্ত আর দ্বিতীয় নাই। সকলেই বলিত আহা কি ভক্তি! যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ লোকটী বসিয়া থাকে ইহার চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। এক দিন সকলে জিজ্ঞাসা করিল হ্যাঁগা তুমি যেরূপ ক্রন্দন কর ইহাতে আমাদের প্রাণ ফাটিয়া যায় আহা তোমার কি ভক্তি তুমি কি ভাবে কাঁদ যদি আমাদের একটু বলিয়া দেও তাহা হইলে আমরাও তোমার ন্যায় কাঁদিয়া প্রাণ শীতল করিতে পারি। স্ত্রীলোক বলিল বাছা সকল! আমি ভক্তি ভাব কিছুই বুঝি না; আমার মনে অন্য কোন ভাব আসে না এবং গানও তত বুঝিতে পারি না কিন্তু ঐ অধিকারী যখন চামরটী নেড়ে গান করে তখন আমার নিজের একটী মৃত ছাগলকে মনে পড়ে আর চক্ষের জল থামে না। উহার চামর দেখিলেই আমার সেই ছাগলটীর দাড়িগুলি মনে হয় আর বুক ফাটীয়া উঠে। সকলে এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া কোথায় চণ্ডীর গান আর কোথায় ছাগলের দাড়ী মাগির মনের ভাব দেখ!

বৎস! পূর্ব্বোক্ত যে দুইটী ভাবুকের কথা বলিলাম ইহাদের উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ জানিবে; একজনের ভাব শোক মোহ পূর্ণ যাহাতে শরীর শীর্ণ হয় মন বিকৃত হয়; আর একজনের ভাবে শরীর শান্তরসে অভিষিক্ত হয়। একজনের অধঃস্রোতস্বীনী গতি আর একজনের উর্দ্ধ স্রোতস্বিনী গতি, একজন নিঃসঙ্গ আর একজন আবদ্ধ। এক জনের অন্তর্মুখী গতি, অন্য জনের বহির্মুখ্ গতি।

শিষ্য। প্রভো! ভাবের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপনা কি প্রকারে হয় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। ভাব কি এবং ভাবের গাঢ়তাই যে ভক্তি ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই ভাবের দ্বারা মনে কতকগুলা বৃত্তির উৎপত্তি হয় তাহাতে ভাবুক ভক্তগণ ভগবানের নাম গুণে তন্ময় হইয়া যান। সাণ্ডিল্য মুনি বলিয়াছেন :—

সম্মান বহুমান প্রীতি বিরহেতর বিচিকিৎসা মহিমখ্যাতি তদর্থ প্রাণ স্থান স্বদীয়তা সর্ব্বতদ্ভবাপ্রাতি কুল্যাদীনি চ স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ॥ অর্থাৎ সম্মান বহুমান প্রীতি বিরহ ইতর বিচিকিৎসা মহিমা কীর্ত্তন প্রিয়তমের জন্য প্রাণধারণ, স্বদীয়তা অপ্রাতিকুল্য ইত্যাদি মহাভাবের লক্ষণ। বৎস! যাঁহারা ভগবানের কোন নাম বা রূপ বিশেষে সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করেন তাঁহাদের তাহাতে ক্রমে এতদূর সম্বন্ধ জন্মায় যে, সেই নাম বা রূপের কথা শুনিলেই তাঁহারা উন্মাদ হইয়া পড়েন। ভাবুক ভক্তগণ ভগবানের নাম ওরূপ স্বীয় অন্তরেন্দ্রিয়ে এরূপ নিবিষ্ট করিয়া ফেলেন যে যখনি সে নাম শ্রবণ করেন তখনি অমনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়েন। সেই জন্য প্রহ্লাদ "ক" লিখিতে যাইয়া তাঁহার অন্তরাত্মার স্মৃতিসূত্রে প্রতিঘাত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন সেইজন্য গৌরাঙ্গ সাগরের নির্ম্মল জল দেখিয়া কৃষ্ণপ্রেমে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভাবের আশ্চর্য্য গতি; কাহার কিসে ভাব হয় কেহ জানে না আবার সামান্য বিষয়ে সামান্য কথায় সামান্য ঘটনায় ভাবোদয় হয়, সেই জন্য কবি বলিয়াছেন '—ও যার হবার হয় তার প্রেম উথলে দুর্ব্বাঘাসে। প্রহ্লাদ "হ" বলে নয়ন জলে ভাসে হরিনামের "হ" বলে নয়ন জলে ভাসে। প্রেমে নদেবাসী চৌর ভুলাইল গৌর মাতাইল গৌর সেই বয়সে॥

বৎস! ভাব ভিন্ন ভগবানে ভক্তি হয় না এবং এই ভাব ভিন্ন ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনকে পাওয়া যায় না। ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন :—

মন কর কি তত্ত্ব তারে ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥

মন অগ্রে বশীভূত কর তোমার আপন শক্তিসারে।
ওরে কোটার ভিতর চোর কুটরি, ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড় দর্শনে দর্শন মিলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে॥
যে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে, যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃ ভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌ব হাঁড়ি বুঝব কি মন ঠারে ঠোরে॥

রামপ্রসাদের এই পদটী গভীর ভাব পূর্ণ। বিশেষতঃ "হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে" এই পদটুকু সারত্বে ভরা। বস্তুতঃ ভাব হইলে ভাবুকের মন ঠিক চুম্বুক পাথরের ন্যায় হইয়া যায় অর্থাৎ যেরূপ চুম্বক পাথর সর্ব্বাবস্থায় লৌহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে সেইরূপ ভাবুকের মন ভগবানকে বৈকুণ্ঠ হইতে আকর্ষণ করিয়া মর্ত্য-ধামে আনিয়া থাকে। ভগবান নিজেই বলেন "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে নচঃ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

শিষ্য। প্রভো! যে পঞ্চরসের কথা আপনি বলিয়াছিলেন তাহার সাধনে ভক্তি কিরূপে হয় আমায় বলিয়া দেন আর ভগবান কি সকল রস সমান ভাবে গ্রহণ করেন।

গুরু। বৎস! পঞ্চরসের কথা যাহা বলিয়াছি তাহার যে রসের যে সাধক তিনি সেই রসের বিষয় যতই ভাবিবেন তাঁহার মনে ততই ভাবাবেশ হ-ইবে ওক্রমে ভক্তির স্ফর্ত্তি হইবে। বৎস! তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ভগবান রসবিশেষের বশীভূত, রস ভিন্ন তাঁহার প্রেমামৃত আস্বাদন করা অসম্ভব। ভক্তগণ তাঁহাকে নানা রসে রসিক করিয়া রসময় নাম ধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। এই রসকেলি প্রচার করিবার জন্যই ভগবান বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া মর্ত্তে অবতীর্ণ হয়েন এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। দেখ, এক দিকে গভীর রজনীতে ঘোর অরণ্য মধ্যে গোপাঙ্গনাগণ তাঁহাকে স্বা-মিত্বে বরণ করিয়া রসসম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গণ করিতেছেন, অন্য দিকে নন্দ যশোদা প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার জন্য নবনী ত লইয়া পুত্রবৎসল স্নেহে

গোপাল গোপাল বলিয়া আহ্বান করিতেছেন। একদিকে হনুমান বিভীষণাদি ভক্তগণ তাঁহাকে প্রভু বলিয়া অবনত মস্তকে পদপ্রান্তে পতিত, অন্য দিকে শ্রীদামাদি রাখালগণ গোষ্ঠে গোচারণ করিতে করিতে তাঁহার স্কন্ধে উঠিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। এক দিকে ভক্ত রামপ্রসাদ তাঁহাকে মা মা বলিয়া কতই অভিমান করিতে ছেন আবার অন্যদিকে গভীর অরণ্যবাসী সমাধিস্থ শমীক ঋষি স্বায় আত্মাকে পরমাত্মায় লীন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন। আহা! এ সকল বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন মনোভাব, ভাবগ্রাহী ভগবান ভিন্ন কে গ্রহণ করিতে পারে? তিনি রসের সাগর সেই জন্য তাঁহারই নিকট সকল রসের সামঞ্জস্য হইয়াছে।

বৎস! ভাবুকের ভাব উদ্দীপনার মূল এই রস পঞ্চককে যেরূপে গ্রহণ করিবে তাহাতেই সিদ্ধত্ব লাভ হয়। রসিক ভাবুকগণের ভাবাবেশ হইলে ঘন ঘন রোমাঞ্চ ও কণ্ঠ রোধ হয় তাহারা অনবরত অশ্রুপাত করিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া জগৎকে যে ভাব দেখান তাহা আশ্চর্য্য! ভাবুক ভাব রাজ্যে যে দুর্ল্লভ ধন দর্শন করেন, যে মধুরতা আস্বাদন করেন তাহা অনির্ব্বচনীয় তাহা মূকের রসাস্বাদনের ন্যায় অপ্রকাশ্য!

বৎস! ভাবুক ভক্তগণ সাধারণ লোকের নিকট সাধারণ ভাবে প্রতীয়মান হয়েন বটে কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে এ রাজ্যের লোক নহেন। লোকে দেখে হস্ত পদ বিশিষ্ট একটা মানুষ কিন্তু তাহাদের অন্ত সামান্য বুদ্ধিতে ধারণা হয় না। এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রসিদ্ধ ভাবুক ভক্ত স্বামী হরিদাসের জীবন। স্বামী হরিদাসের চরিত্র আদ্যোপান্ত আনন্দে পরিপূর্ণ তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও যেরূপে তিনি সর্ব্বদা ভাবাবেশে বিহ্বল থাকিতেন তাহা অতি সংক্ষেপে তোমার নিকট আভষ দিতেছি তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে ভাবুক ভক্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচরণ করিলেও এবং যাবতীয় লৌকিক কার্য্য করিলেও তাঁহারা এ রাজ্যের লোক নহেন।

———o———

স্বামী হরিদাস।



হরিদাস প্রসিদ্ধ গায়ক তান্‌সানের গুরু ছিলেন। স্বামীজী যেমন সুগায়ক তেমনি ভক্তেরও চূড়ামণি ছিলেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ ভাবিতেন ভগবান তাহার স্বামী এবং তিনি তাহার সখা এই ভাবনায় তিনি সর্ব্বদাই মানসে ভগবানের সেবা করিতেন। তিনি ভাবাবেশে কখন উচ্চৈস্বরে রোদন করিতেন, কখন আহ্লাদে আটখানা হইতেন আবার কখন শোকে অভিভূত হইতেন। স্বামীজী সর্ব্বক্ষণ মানসে ভগবানকে পূজা করিতেন, তিনি হরিসাধনের জন্য মানসে জগতের যাবতীয় নূতন ও সুন্দর দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেন এবং নানাপ্রকার দিব্যালঙ্কারে প্রাণনাথকে বিভূষিত করিয়া প্রাণ খুলিয়া পূজা করিতেন তাহার পূজা বাহ্যত কিছুই হইত না, সর্ব্বক্ষণ মনের ভাবে মাতিয়া নানা চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন কেহ তাহার অন্ত পাইত না। একদিন তাহার কোন সেবক অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এক শিশি আতর আনিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিল। স্বামীজি তখন মানসে যমুনা পুলিনে বসিয়া ভগবানের সহিত হোলি খেলিতেছিলেন। হোলি খেলিতে খেলিতে যাই স্বামীজির গায়ে ভগবান গুলাল রং, ঢালিয়া দিলেন স্বামীজি তৎক্ষণাৎ শিষ্য প্রদত্ত আতর তাহার শ্রীঅঙ্গে ঢালিয়া দিলেন। সেবক সেইখানে দাণ্ডায়মান হইয়া দেখিল যে, স্বামীজি তাহার অতি যত্নের আতর যমুনার বালুকায় নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে যারপর নাই দুঃখিত হইয়া ভাবিল হায় হায়! স্বামীজি আমার আতরটুকু গ্রহণ করিলেন না। ভাবুক ভক্ত স্বামীজির সেবকের মনোভাব গ্রহণ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন বৎস! তুমি একবার শীঘ্র বেহারিজীর মন্দির দর্শন করিয়া এসগে। সেবক গুরু আজ্ঞায় অবিলম্বে বেহারিজীর শ্রীমন্দিরে যাইলেন। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই আতরের সুগন্ধে আনন্দিত হইয়াছিলেন তৎপরে বেহারিজীকে দর্শন করিয়া

দেখেন সেই সুন্দর বিগ্রহের মস্তক হইতে দরদরিত আতর পড়িতেছে। সেবক তখন আহ্লাদে পুলকিত হইলেন এবং ভাবিলেন আহা! অদ্য আমার আতর অখিলাত্মা ভগবান মস্তকে ধারণ করিয়াছেন ধন্য স্বামীজির ভক্তি। সেবক তৎক্ষণাৎ গুরুর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। বৎস! ভাবুক ভক্তেরা বস্তুতঃ যে এ রাজ্যের লোক নহেন তাহা সত্য কি না এখন বুঝিয়া দেখ।



ভক্তির উৎপত্তি ও সাধুসঙ্গের প্রভাব।

শিষ্য। প্রভো! আপনার মুখে অমৃতপ্রদ অপূর্ব্ব ভক্তি উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। এখন ভক্তি কিরূপে উৎপত্তি হয় আমাকে বলুন।

গুরু। বৎস! ভক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ১৬ শ্লোকে শ্রীসুত গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ—

শুশ্রুষাঃ শ্রদ্ধানাস্য বাসুদেব কথারুচিঃ।

স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রা পুণ্যতীর্থ নিসেবনাৎ॥

অর্থাৎ পুনতীর্থে বাস করিয়া সাধু মহাজনের সেবা করিলে স্বাত্বিকী শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, শ্রদ্ধা হইতে রুচি এবং রুচি হইতে ক্রমে ভক্তির উদয় হয়। এই কথার সমর্থন করিয়া পরম ভাগবৎ শ্রীরূপ-গোস্বামী "ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে" বলিয়াছেন ঃ—

আদৌ শ্রদ্ধাততঃ সাধুসঙ্গশ্চ ভজনক্রিয়া।

ততোঽনর্থ নিবৃত্তি স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রূচিস্ততঃ॥

যথাশক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেম উদঞ্চতি।

সাধনানাময়ং প্রেম্নো ভাবো ভবেৎ যথাক্রমং॥

অর্থাৎ প্রথমে ভগবৎ কথাদিতে শ্রদ্ধা উপস্থিত হয় তৎপরে সাধু-সঙ্গ, সাধুসঙ্গগুণে শ্রবণ কীর্ত্তন হয়, শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে সর্ব্ব-প্রকার অনর্থ নিবৃত্তি হয়, সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবারিত হইলে নিষ্ঠা হয় সেই নিষ্ঠাই শ্রবণাদিতে রুচি উপস্থিত করে, আবার রুচি হইতে আসক্তি এবং আসক্তি হইতে চিত্তে রতির উদয় হয়, সেই রতি হইতে ভক্তির উদয় হয়।

বৎস! ভগবান কপিলদেবের মতে সাধুসঙ্গই ভক্তির কারণ তিনি যখন স্বীয় মাতা দেবহুতিকে উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সময় বলিঁয়া ছেন ঃ—

মদাশ্রয়া কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।

তপন্তি বিবিধাস্তপো নৈতান্মদ্গত চেতসঃ॥

ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বর্থতে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষ হরাহিতে॥
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য সম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণা দাশ পবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতি ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি॥

হে মাত! সাধু সঙ্গই ভক্তির কারণ যেহেতু তাহারা সর্ব্বদাই আমার বিশুদ্ধ কথা শ্রবণ এবং আমার বিশুদ্ধ কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে স্বাধ্বি আপনি ঐ প্রকার সাধুজন সঙ্গ করিতেই সর্ব্বক্ষণ বাঞ্ছা করিবেন। সাধুদিগের মহৎগুণ এই যে, তাঁহারা সঙ্গজনিত দোষ সকল হরণ করিয়া থাকেন এবং আমার বীর্য্য প্রকাশক কথা উপস্থিত করিয়া চিত্তকে আকর্ষণ করেন। সাধুদিগের শ্রীমুখ বিনির্গত অমৃতময়ী ভগবতী কথা শ্রবণ করিলে শ্রদ্ধার উদয় হয় সেই শ্রদ্ধা হইতে রতি এবং সেই রতি হইতে ভক্তির উদয় হয়। বৎস! সাধুসঙ্গই ভক্তি উৎপত্তির কারণ এ কথা শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৎস! সাধু সঙ্গের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য সহস্র বৎসর যোগ তপস্যা করিয়া যাহা লাভ না হয় তাহা একবার সাধুসঙ্গ করিলে লাভ হয় সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে বলিয়াছেন :—

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবামৃচ্ছিলাময়া।
তে পুণ্যন্ত্যরু কালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

অর্থাৎ হে অক্রূর! গঙ্গাদী তীর্থ এবং দেবতাগণ যাঁহাদিগকে পবিত্র করিতে না পারেন সাধুগণ দর্শনমাত্র তাহাদিগকে পবিত্র করেন। সাধু সঙ্গের গুণে যে ভক্তির উৎপত্তি হয় এ কথা পরম প্রেমিক নারদ ঋষিও বলিয়াছেন :—" ওঁ মুখ্যতস্তু মহৎ কৃপয়ৈব ভগবৎ কৃপালেশাদ্বা " অর্থাৎ মহাত্মাদিগের কৃপাদৃষ্টিই ভক্তি লাভের উপায় স্বরূপ। এই সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা দ্বারাই দেবর্ষি নারদ প্রথমে ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ব্যাস নারদীয় সংবাদ এইরূপ লেখা আছে :—

অহং পুরাতীত ভবে ভবং মুনেঃ দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদি নাম।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্॥
তেমষ্য হ্যপেতাখিল চাপলেহর্ভকে দান্তে ধৃত ক্রীড়ন কেহনুবর্তিনি।
চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্য দর্শনাঃ শুশ্রূষমাণে মুনয়োহল্প ভাষিণি॥
উচ্ছিষ্ট লেপানমুমোদিতো দ্বিজৈঃ সকৃৎস্ম ভুঞ্জে তদপাস্ত কিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধ চেতসঃ তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে॥
তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তাম অনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেহনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমা ভবদ্রতিঃ॥

অর্থাৎ হে ব্যাস! আমি পূর্ব্ব জন্মে কোন এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ভাগ্যক্রমে আমার জননী একজন বেদবাদী ঋষির দাসত্ব করিতেন। একদা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সময়ে অনেক যোগী ঋষি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যোগিগণ আমাকে বালক দেখিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত করেন। আমি বাল্যকালে স্বভাবতঃ চাপাল্য বর্জ্জিত শান্ত এবং ক্রীড়াজ্ঞানহীন ছিলাম বলিয়া সাধুগণ আমার প্রতি বিশেষ কৃপা করিতেন আমিও মিতভাষী এবং স্মরণাগত হইয়া তাহাদের আজ্ঞাবহ থাকিতাম। সেই সকল সাধুগণ আহার করিলে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পাত্রস্থ অবশিষ্টান্ন আমি আহার করিতাম। সেই সাধুদিগের প্রসাদ আহার করাতে আমার চিত্ত অতি বিশুদ্ধ হইয়াছিল। হে ব্যাস! সেই সকল ঋষিগণ প্রত্যহই মনোহর হরি কথা বলিতেন আমি তাহা স্থির চিত্তে শ্রবণ করতাম সেই কারণে আমার দুর্ল্লভ ভক্তি ধন লাভ হইয়াছিল।

বৎস! সাধু সঙ্গের মহিমা সম্বন্ধে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন:—
নলিনীদল গত জলবরবলং তদ্বজীবন মতিশয় চপলং।
ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতি রেকা ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা॥

অর্থাৎ পদ্মপত্রস্থিত জলের যেরূপ তরল ও চঞ্চল গতি সেইরূপ মানব জীবন অতিশয় চঞ্চল কিন্তু মুহূর্ত্তকাল সাধুসঙ্গ করিলে এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বৎস! সাধুদিগের মহৎগুণ এই যে তাঁহারা কৃপা করিয়া বহিঃর্মুখ জীবকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া দেন। যেরূপ

রোগী ঔষধ সেবন করিতে অনিচ্ছুক হইলেও হিতাকাঙ্ক্ষী জনক জননী সন্তানকে কখন বলপূর্ব্বক কখন নানাপ্রকার প্রলোভন দ্বারায় সেই তিক্ত কষা ঔষধ সেবন করান সেইরূপ সাধু মহাত্মাগণ ভবরোগাক্রান্ত জীবকে ভগবৎ সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করিয়া রোগের শান্তি করিয়া থাকেন। আবার সাধু মহাজনের নিকট থাকিলে তাহাদের শরীরের প্রত্যেক লোমকূপ হইতে যে সাধুভাব নির্গত হয় তাহা দ্বারা নিকটস্থ ব্যক্তির আপনা আপনি ভাবাবেশ হয়। একজন বক্তা হয়ত জীবনাবধি বক্তৃতা করিয়া একজনেরও মন আকর্ষণ করিতে পারিবেন না কিন্তু একজন সাধুর একটী মাত্র কথায় শত শত লোকের মন ফিরিয়া যায় তাহার কারণ এই যে, সাধুগণ যাহা বলেন তাহা গাঢ় বিশ্বাসের এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল। তাঁহাদের প্রত্যেক কথার অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস ভক্তি ও ভাব মাকামাকি থাকায় তাহা হৃদয়কে সহসা আকর্ষণ করে। বৎস! সাধুসঙ্গের কতদূর প্রভাব তাহা আমি তোমাকে কত বলিব শাস্ত্রে এ সম্বন্ধ অনেক কীর্ত্তন আছে।

ভাগবতের (সপ্তম স্কন্ধে) লেখা আছেঃ—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্য শুদ্ধন্তি বৈগৃহাঃ।
কিং পুনদর্শন স্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥

অর্থাৎ সাধুদিগের স্মরণমাত্রই সর্ব্বপাপ দূর হয় অতএব দর্শন স্পর্শনের মহিমা যে কত তাহা বলা যায় না। আবার একস্থানে লেখা আছে ঃ—

মূহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যত্র তিষ্ঠন্তি সাধবাঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং তত্তীর্থং তত্তপোবনং॥

অর্থাৎ মূহূর্ত্তকাল বা অর্দ্ধ মূহূর্ত্তকাল যেস্থানে সাধুগণ অবস্থান করেন নিশ্চয়ই সেই স্থান তীর্থ ও তপোবন হয়।

আদি পুরাণ বলেন ঃ—

সাধুসঙ্গ পরিষবঙ্গাদ সাধোরপি সাধূতা।
অগঙ্গামপি গঙ্গাস্যাদগঙ্গায়াং, পতিতং পয়ঃ॥

অর্থাৎ সাধুসঙ্গের গুণে অসাধুও সাধু হইয়া যায় এবং ইহার গুণে অগঙ্গাজল গঙ্গাজল হইয়া যায়।

বৎস! সাধুসঙ্গের গুণে যে ভক্তি হয় শাস্ত্রে বলা হইয়াছে তাহার কারণ সাধুদিগের দর্শন মাত্রই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সেই জন্য কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

গীতায়াঃ শ্লোকপাঠেন গোবিন্দ স্মৃতি কীর্ত্তনাৎ।

সাধু দর্শনমাত্রেন তীর্থকোটী ফলং লভেৎ॥

গীতার শ্লোক পাঠ করিতে হয়, গোবিন্দ নাম স্মরণ করিতে হয় তবে পাপ বিনষ্ট হয় কিন্তু সাধুদিগের দর্শনমাত্রই কোটী কোটী তীর্থের ফল লাভ হয় এবং সর্ব্বপাপ দূর হয়।

বৎস! সাধুদিগের সেবা শুশ্রূষা করিলে তাঁহারা প্রসন্ন হয়েন সেই প্রসন্নতাই ভক্তি লাভের উপায়। উপদেশ না পাইলেও ভগবানের এমনি নিয়মবন্ধ আছে যে সাধুসেবা করিলেই ভগবান প্রসন্ন হয়েন এবং সাধু-সেবানুরত লোকের অন্তঃকরণে ভক্তির শ্রোত প্রবাহিত করেন। ভগবান বলেন—"আমাকে যে ভক্তি করে সে আমার তত প্রিয় নহে কিন্তু যে আমার ভক্তকে ভক্তি করে সে আমার তদপেক্ষা প্রিয়। যথা আদি পুরাণেঃ—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তেমে ভক্ত তমা মতাঃ॥

সাধুলোকের সেবা করিলে কেন ভক্তির উদয় হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় না কারণ যাহাতে ভগবান প্রসন্ন হয়েন তাহা ভিন্ন ভক্তির উৎপত্তি ও সাধনের অন্য উপায় নাই। ভগবান ভক্তির বিভাগটী সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্বাধীন করিয়া রাখিয়াছেন তিনি যাঁহাকে স্মরণাগত ও বিনীত দেখেন তাঁহাকেই এই দুর্লভ ধন বিতরণ করেন।

শিষ্য। প্রভো! আপনি সাধু সঙ্গের ও সাধু সেবার ফল যাহা বলিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইলাম কিন্তু সাধুদিগের বিশেষ লক্ষণ কি এবং তাঁহাদের উপদেশ লাভ না হইলেও কিরূপ দুরন্ত ও চঞ্চল মন ভক্তিপথে আকৃষ্ট হয় তাহা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন।

গুরু। বৎস! যাঁহারা অতি দীনাত্মা সকলের নিকট বিনীত, যাঁহাদের সকল জীবের উপর দয়া আছে এবং যাঁহাদের বুদ্ধি ব্যবসয়াত্মিকা অর্থাৎ ভগবানের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাঁহারাই সাধুপদবাচ্য। সাধু ভক্তগণ ভগবানের জন্য অনায়াসে সর্ব্বস্ব বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়েন; তাঁহারা প্রহ্লাদের ন্যায় পূজনীয় পিতাকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়েন ব্রজগোপীকাদিগের ন্যায় স্বামী পুত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। এরূপ ভক্তের মন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিরন্তর ন্যস্ত থাকে। তাঁহাদের গতিবিধি ও ভাব সামান্য স্থূলবুদ্ধিতে ধারণা হয় না। সত্য কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাদের সরস ভাবেই লোককে মোহিত হইতে হয়। যে অহঙ্কার জগতবাসী সকল লোকেই উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে যাহা ভক্তি পথের মহাকণ্টক স্বরূপ তাহা সাধুভক্তের হৃদয়কে কলুষিত করিতে পারে না কারণ তাঁহারা চিরদিনের জন্য বিনয়ে অবনত হইয়াছেন। সেরূপ নিরহংকারী লোকের দর্শনমাত্রই স্বভাবতঃ অহঙ্কার ও প্রমত্তভাব দূর হয় এবং বাক্যের শ্রোত কমিয়া যায়। বৎস! জঠরস্থ অনল যেরূপ ভুক্ত অন্নাদি জীর্ণ করে সেইরূপ সাধুসেবা দ্বারায় সমস্ত পাপ ও তাহার মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। অনেক ভক্ত লোকের জীবন চরিত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে চিরদিন পাপাচরণ বেশ্যাসক্ত থাকিয়াও অনেকে ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ করিয়া সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তিত এবং পরিশেষে মহাভাগবত হইয়াছেন। নবদ্বীপে জগাই মাধাই নামে দুইটী ব্রাহ্মণ সন্তান ছিল। তাঁহারা দুই সহোদর বাল্যকাল হইতে ঘোর মদ্যপায়ী ও অত্যাচারী ছিল কিন্তু একদিন এক মূহুর্ত্তকের সাধুসঙ্গে তাহারা একেবারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং পরিশেষে এরূপ ভক্ত হইয়াছিল যে, অদ্যাবধি তাহারা দৃষ্টান্তস্থল হইয়া আছে। বৎস! আমি তোমার নিকট বিল্লমঙ্গলের জীবন চরিত্র বলিতেছি ইহাতে আরও এ বিষয় বুঝিতে পারিবে। তিনি একজন মহাপাপী হইয়াও একটী বণিক রমণীর সাধুভাব দেখিয়া চিরপ্রসিদ্ধ ভক্ত হইয়াছিলেন।

বিল্লমঙ্গল চরিত্র।



বিল্লমঙ্গল কোন এক ব্রাহ্মণের একমাত্র বংশধর ছিলেন। অল্প বয়সেই পিতৃহীন হওয়াতে এবং অন্য কোন অভিভাবক না থাকায় তিনি একজন ঘোর ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া উঠেন। চিন্তা নাম্নী একটী বেশ্যার প্রেমে নিতান্ত আশক্ত ছিলেন গৃহ পরিবার সমস্ত পরিত্যাগ করত দিন রাত্র সেই বেশ্যার চিন্তাই তাহার হৃদয়কে অধিকার করিত। একদা বিল্লমঙ্গলের পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিনে চিন্তা বলিল—দেখ বিল্লমঙ্গল, অদ্য তোমাকে পবিত্রভাবে গৃহে অবস্থান করিতে হইবে, অতএব অদ্য রাত্রে আর তোমার আসিবার প্রয়োজন নাই। বিল্লমঙ্গল তাহাতে স্বীকৃত হইয়া গৃহে যাইলেন। দিবসে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকায় চিন্তার জন্য ক্ষণমাত্র চিন্তা করিতে পারিলেন না, কিন্তু রজনীতে যখন অবসর হইল তখন দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় উত্তেজনায় অধীর হইয়া রাত্র দ্বি-প্রহর সময়ে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

ঘোর অন্ধকার অনবরত বারিবর্ষণ ও মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎছটা হইলেও বিল্লমঙ্গলের কামবেগ নিবারণ করে কার সাধ্য। বস্তুতঃ কাম পরতন্ত্র হইলে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না এবং বিপদাপদের ভয় মাত্র হয় না। বিল্লমঙ্গল ক্রমে অন্ধের ন্যায় কৃষ্ণবেন্না নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু নদীর প্রকৃতি এত ভয়ঙ্কর যে কাহারও সাধ্য নাই যে, উহা উত্তীর্ণ হয়। নৌকা ইত্যাদি না থাকায় কামুক বিল্ল-মঙ্গলের মহা সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তাহার কামবেগ অতি প্রবল থাকায় অগ্র পশ্চাৎ ভাবিবার সময় ছিল না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে চিন্তার জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি জলে লম্ফ প্রদান করি-লেন এবং সন্তরণ দিয়া কিছু দূর যাইলে ভেলার ন্যায় একটী অবলম্বন পাইয়া তদ্দ্বারায় নদী উত্তীর্ণ হয়েন। নদী পার হইয়া বেশ্যার ভবনে উপস্থিত হইলে দেখেন যে, দ্বারদেশ বন্ধ বাটীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া

বেড়াইলেন এবং অনেক ডাকিয়াও কাহার উত্তর পাইলেন না। পরে প্রাচীরে একটী সুদীর্ঘ রজ্জু ঝুলিতেছে দেখিয়া সেইটীকে অবলম্বনপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেই গভীর ঘোর রজনীতে যখন বিল্বমঙ্গল চিন্তার ঘরে যাইলেন, তখন সে স্তম্ভিতা হইল এবং কোন্ উপায়ে বিল্বমঙ্গল নদী উত্তীর্ণ হইয়া বাটীর ভিতরে আসিলেন তাহা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল। বিল্বমঙ্গল যে উপায়ে নদী উত্তীর্ণ হইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা সবিশেষ বলিলে সুবুদ্ধি চিন্তার মনে সন্দেহ হইল। সে তৎক্ষণাৎ বিল্বমঙ্গলকে সঙ্গে লইয়া নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে বিল্বমঙ্গল যেটিকে ভেলা বিবেচনা করিয়াছিলেন সে একটি দুর্গন্ধময় শব এবং যেটি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন সেটি রজ্জু নহে একটী কাল সর্প। তখন সুবুদ্ধি চিন্তা কামুক বিল্বমঙ্গলের কামান্ধতা বিশেষরূপে বুঝিয়া অবাক্ হইল। যদিও চিন্তা একজন সামান্য বেশ্যা ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয়ে বিবেক বৈরাগ্যের ভাব গূঢ়রূপে নিহিত থাকায় সে বিল্বমঙ্গলকে বিলক্ষণ র্ভৎসনা করিল এবং বলিল ছি ছি! তুমি এতদূর জঘন্য ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়াছ যে মৃত দেহ ও কাল সর্প জ্ঞান করিতে পার নাই। এতদূর কামোন্মত্ত হইয়াছে যে, পূতিগন্ধময় শবের দুর্গন্ধেও তোমার সমাধি ভঙ্গ হয় নাই এবং জীবনান্তক কাল সর্পের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিতেও ভীত হও নাই। তুমি যেরূপ আসক্তিতে আমার ন্যায় সামান্য বেশ্যার প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছ; যদি এইরূপ আসক্তিতে ভগবানকে ডাকিতে তাহা হইলে এতদিন অনায়াসে মোক্ষপদ লাভ হইত। আমার ঘৃণা বোধ হইতেছে যে, তোমার ন্যায় কামান্ধ লোকের প্রণয়ে আমি এতদিন আবদ্ধ ছিলাম। এতদিন পরে জানিলাম যে, তুমি প্রকৃত প্রণয়ের পাত্র নহ, অতএব তুমি এখন যেথানে ইচ্ছা গমন কর।

চিন্তার সারগর্ভ র্ভৎসনায় কামান্ধ বিল্বমঙ্গলের অতিশয় লজ্জা উপস্থিত হইল। তিনি তখন মনে মনে ভাবিলেন হায়! সামান্য একজন বেশ্যা আমাকে এরূপ শ্লেষ বাক্য বলিল—হায়! আমি যাহার জন্য এত ব্যাকুল সেই আমাকে এত ঘৃণা করিল। তখন এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা

করিতে করিতে সেই কামমোহিত ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত বিল্বমঙ্গলের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল এবং এতদূর অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ গোপনে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন কাহার নিকট যাইবেন এবং কি করিবেন তাহার স্থিরতা ছিল না। কিছু দিবস ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া একদিন কোন স্থানে একজন সাধুর শরণাগত হইলেন, সেই সাধু তাঁহাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল পরে স্থির করিলেন যে, বৃন্দাবনধামে গমন করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন। সেই অভিপ্রায় ক্রমে যে চলিতে লাগিলেন কিন্তু একে পথ অতি দুর্গম, তাহার উপর অনশন, তাঁহার শরীর অতিশয় কৃশ হইতে লাগিল। একদিন অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পথিমধ্যে একটী সরোবরের তীরে বিশ্রাম করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় নিকটবর্ত্তি কোন এক গ্রামের একজন ভাগ্যবন্ত বণিকের স্ত্রী সেই সরোবরে স্নানার্থে আগমন করিলেন। বিল্বমঙ্গল বণিক রমণীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং কামপরতন্ত্র হইয়া সেই রমণীর পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। রমণী স্নানাদী সমাপন করিয়া যখন গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, বিল্বমঙ্গলও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রমণী স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেও তিনি "কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়" হইয়া সেই ভবনের দ্বারদেশে উন্মত্তপ্রায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

গৃহস্বামী বণিক একজন অতি সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার দ্বারে অতিথি উপেক্ষা করিতেছেন শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং করযোড়ে অতিথিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন প্রভো! অকীঞ্চনের বাটীতে আসিয়া এত অকৃপা কেন। আপনার পদার্পণেই গৃহ পবিত্র হইয়াছে, এখন আসিয়া পূজা গ্রহণ করুণ। বিল্বমঙ্গল গৃহস্বামীর স্তুতিতে প্রীত হইয়া বলিলেন মহাশয়! আপনার কথায় আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি কিন্তু আমি যাহা চাহি তাহা যদি দেন তবে আতিথ্য স্বীকার করিতে পারি নতুবা করিব না। গৃহস্বামী অতি আনন্দে বলিলেন প্রভু! যে আজ্ঞা হয় বলুন যথাসাধ্য পালন করিব। বিল্বমঙ্গল বলিলেন মহাশয়, আপনার স্ত্রীকে দেখিয়া

আমি কামপরতন্ত্র হইয়াছি অতএব তাঁহাকে আমার নিকট অদ্য রজনীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। বণিক অতিথির কথা শুনিয়া বলিলেন প্রভো! এই সামান্য বিষয়ের জন্য আপনি এত চিন্তা করিতেছেন কেন, আপনি স্নানাহার করুণ রজনীতে আমার স্ত্রী অবশ্যই আপনার নিকট আসিবেন।

বিল্বমঙ্গল বণিকের অঙ্গীকার শুনিয়া পরমানন্দে আহারাদি করিলেন। দিবাভাগ অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলেন পরে রজনী উপস্থিত হইলে তিনি সেই বণিক রমণীর মিলন ইচ্ছায় অধীর হইলেন। ওদিকে বণিক অতিথিকে অঙ্গীকার করিয়া এক বিষম শঙ্কটে পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন অতিথি বৈমুখ ও স্ত্রীর সতীত্বনাশ এ উভয়ই সমান। আবার কি করিয়াই বা স্ত্রীকে এ বিষম কথা বলিবেন এই ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। বণিকপত্নী স্বামীকে শোকাকুল দেখিয়া বলিলেন প্রভো! আপনি এত গভীর চিন্তায় মগ্ন কেন, আপনার হৃদয়ে হঠাৎ কি নিদারুণ শোক উপস্থিত হইল বলুন। সাধ্যা স্ত্রীর অমিয়ময় বচন শুনিয়া বণিক বলিলেন হায়! আমি দুইখানি শানিত তরবারির মধ্যে পড়িয়াছি, একদিকে তোমার সতীত্ব নাশ, অন্যদিকে অতিথি বৈমুখ এই বলিয়া স্ত্রীর সমীপে সমস্ত বিবরণ বলিলেন। বণিক রমণী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন স্বামীন্! আপনি দুঃখিত হইয়াছেন কেন, যদি আমার সতীত্বনাশ হইয়াও অতিথির পরিতৃপ্তি হয়, তাহাতে আমি কিছুমাত্র ক্ষোভিতা নহি, আমি অতি আনন্দে অতিথির নিকট যাইতেছি, এই বলিয়া সেই সাধ্যা বণিকপত্নী নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া দিব্য বেশভূষা করিয়া এবং অতি সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া নির্ভয় অন্তরে সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তির ন্যায় যেখানে বিল্বমঙ্গল অপেক্ষা করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন। বণিকপত্নী বিল্বমঙ্গলকে বলিলেন প্রভো! দাসী আপনার সেবার জন্য উপস্থিত, যে আজ্ঞা হয় কৃপা করিয়া বলুন।

বিল্বমঙ্গল বণিক রমণীর চিন্তায় তন্ময় ছিলেন হঠাৎ দেখিলেন যে সম্মুখে এক দেবীমূর্ত্তি যেন স্বয়ং আদ্যাশক্তি ভগবতী কৈলাসধাম পরি-

ত্যাগ করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। বণিক রমণী পুনরায় বলিলেন প্রভো! আপনার দাসি আপনার আদেশানুসারে নিকটে উপস্থিত, যাহা আজ্ঞা হয় বলুন। বিল্বমঙ্গল সাধ্যা বণিকপত্নীর সরলতা, ঈশ্বর বিশ্বাস, সাধুভাব ও অতিথিপরায়ণতা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তাঁহার তখন কাম ভাব দূর হইয়া শান্তি ভাব উপস্থিত হইল। আহা! যে পতিব্রতা ধর্ম্মের বলে সাধ্বী সতী সাবিত্রী স্বীয় মৃত স্বামীকে কৃতান্ত হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যে ধর্ম্মের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাইয়া সতী দক্ষালয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সে ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র। সাধ্যা সতী সেই বণিক রমণীর পতিব্রতা ধর্ম্মে ও সাধুভাবে কামুক বিল্বমঙ্গলের পাপ হৃদয় একেবারে বিগলিত হইল। বিল্বমঙ্গল তখন নিজের পাপাভিসন্ধির সহিত ও বণিক রমণীর নিষ্পাপ হৃদয়ের সহিত তুলনা করিতে করিতে অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। সাধ্বী রমণীর আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সেই রমণীর পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন—মাত! আপনি আমার শিক্ষা গুরু এতদ্দিনে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অনুতাপ আসিয়াছে।

বণিকপত্নী অতিথিকে অধীর দেখিয়া বলিলেন প্রভো! আমি অদ্য আপনার সেবা করিয়া জীবন সফল করিব বলিয়া ভাবিয়াছি, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক দাসীর সেবা গ্রহণ করুন। আপনি কেন ব্যাকুল হইতেছেন এবং কেনই বা পদতলে পতিত হইবার জন্য আসিতেছেন। বিল্বমঙ্গল বলিলেন মাত! তুমি আমার সেবা করিবে এ কথা আর বলিও না! আমি বিশেষরূপে শিখিলাম যে ভগবানের উপর যাহাদিগের গাঢ় বিশ্বাস তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। আমি নিতান্ত পাপাত্মা তাই এখনও তোমার সম্মুখে জীবিত রহিয়াছি! যাহাহউক মাত! আপনাকে আমর একটী কথা রাখিতে হইবে। আপনি সত্বর দুইটি সূচিকা আনায়ন করিয়া আমার দুইটি পাপ চক্ষু বিদ্ধিয়া দেন। বণিকপত্নী অতিথির নিদারুণ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ভয়ে ভীতা হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বিল্বমঙ্গল তখন ভয়ানক অনুশোচনায়

দগ্ধীভূত হইতেছিলেন এজন্য তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই কৃতসঙ্কল্প। বণিক রমণীকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া বিল্লমঙ্গল বলিলেন মাত! আমি প্রতিজ্ঞাকরিয়া বলিতেছি যদি তোমার সম্মুখে নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব যদি সূচিকা আনিয়া আমার চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ না কর। আমি যে পাপ চক্ষে তোমাকে কুভাবে দেখিয়াছি তাহা আর ক্ষণমাত্র রাখিতে ইচ্ছা নাই অতএব তোমারি হস্তেই ইহা বিদ্ধ করিয়া লইব। বিল্লমঙ্গলের কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বণিক রমণীকে অগত্যা সূচিকা আনায়ন করত বিল্লমঙ্গলের চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ করিতে হইল কিন্তু বিদ্ধ করিয়া তাঁহার দুঃখের আর সীমা রহিল না।

বিল্লমঙ্গল চক্ষু বিদ্ধ হইলে রমণীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন মাত! এখন কৃপা করিয়া আমাকে পুনরায় সেই বৃক্ষতলে রাখিয়া আসুন। আমি যেস্থানে তোমাকে প্রথমে দেখিয়াছিলাম সেই স্থান হইতেই নবজীবন আরম্ভ করিব। রমণী অতিথির আজ্ঞায় সেই বৃক্ষতলে পুনরায় তাঁহাকে রাখিয়া আসিলেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়ায় বিল্লমঙ্গল আনন্দে উৎফুল্ল। তখন ধীরে ধীরে বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দুই চক্ষু অন্ধ তাহার উপর আবার পথ অতি দুর্গম এ অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবন যাইতে তাঁহার কষ্টের অবধি ছিল না। তিনি কখন গহ্বরে কখন কণ্টকাকীর্ণ বনে অনাহারে শবের ন্যায় পতিত হইতে লাগিলেন। কিছু দিবস পর্য্যন্ত অতি কষ্টে গমন করিয়াছিলেন পরে একটা ভয়ানক কণ্টকাকীর্ণ বনে পতিত হইয়া তাঁহার আর উঠিবার শক্তি রহিল না। অঙ্গে অনবরত রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল, উঠিবার সাধ্য না থাকায় পতিত অবস্থায় রহিলেন। একজন পথিক সেই পথে যাইতেছিলেন হঠাৎ বিল্লমঙ্গলকে বিপন্নাবস্থায় পতিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! আপনি কোথায় যাইবেন এবং কি জন্য এখানে পতিত আছেন। বিল্লমঙ্গল বলিলেন মহাশয়! আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইব কিন্তু অন্ধ পথ দেখিতে পাই না, এজন্য পড়িয়া আছি। পথিক বলিল মহাশয়! আমিও শ্রীবৃন্দাবনে যাইব, আমার সঙ্গে আসুন আমি তোমাকে তথায় পৌঁছিয়া দিব। পথিক এই বলিয়া বিল্লমঙ্গলের হস্তধারণপূর্ব্বক অতি

যত্নে লইয়া চলিলেন। সমস্ত পথ বিল্বমঙ্গলকে যত্ন সহকারে আহার, পান ও বিশ্রাম করাইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে পৌঁছিয়া দিলেন। পথিক বিল্বমঙ্গলকে শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিয়া দিয়া বলিলেন অন্ধ! তুমি বৃন্দাবন পৌঁছিয়াছ, এখন যেখানে ইচ্ছা সেই খানে গমন কর আমি চলিলাম। পথিক এই বলিয়া যখন বিল্বমঙ্গলের হস্ত নিক্ষেপপূর্ব্বক চলিয়া যান, তখন বিল্বমঙ্গলের হঠাৎ চৈতন্য হইল। তিনি ভাবিলেন পিতামাতার ন্যায় সমস্ত পথ যত্ন করিয়া এই বৃন্দাবনধামে আমাকে আনিয়া যিনি চলিয়া যাইতেছেন ইনি কে? ইনি কি মানব না কোন দেবতা—ইনি নিঃস্বার্থ ভাবে আমাকে এত যত্ন করিলেন কেন? মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া অন্ধ বিল্বমঙ্গল স্থির করিলেন যে, ইনি কখনই সামান্য পথিক নহেন—ইনি নিশ্চয়ই সেই ভক্তবৎসল ভগবান হইবেন, যিনি একদিন স্ফটিকস্তম্ভ হইতে প্রকাশ হইয়া ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইনি নিশ্চয়ই সেই প্রেমময় হরি হইবেন যাঁহার প্রেমে বিহ্বল হইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করত শরণাগত হইয়াছিলেন, ইনি নিশ্চয় সেই লজ্জা নিবারণ শ্রীকৃষ্ণ যিনি একদিন অগণ্য রাজন্যবর্গের সম্মুখে বিপদান্বিতা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। ইনি নিশ্চই সেই বৃন্দাবনবিহারী হইবেন যাঁহার জন্য আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করতঃ ব্রজে আসিয়াছি নতুবা নিঃস্বার্থ ভাবে আমার ন্যায় পাপীর জন্য কে এমন মানব আছে যে ব্যাকুল হইবে। বিল্বমঙ্গল এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিলেন হায় হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য হস্তে অমূল্যধন পাইয়া হারাইলাম হায়! যাঁহার জন্য আমি বৃন্দাবনে আসিলাম সেই বৃন্দাবনবিহারীকে হস্তে পাইয়া হারাইলাম। বিল্বমঙ্গল তখন শ্রীহরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

হস্তং নিক্ষেপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াৎ যদিনির্যাসি পৌরুষং গণয়ামিতে ॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ তুমি হস্তনিক্ষেপপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছ কিন্তু যদি হৃদয় হইতে পলায়ন করিতে পার তাহা হইলেই তোমার পুরুষত্ব জানিব। অন্ধ বিল্বমঙ্গলের যে কথা সেই কাজ। তিনি বৃন্দাবনে এমনি হরিনাম

সাধন আরম্ভ করিলেন যে ভক্তবৎসল হরি তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং পরিশেষে সাক্ষাৎ না দিয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

একদিন বিল্লমঙ্গল অনশনে পতিত থাকিয়া হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় একটী গোপবালকের রূপ ধারণ করিয়া ভগবান প্রসাদ মস্তকে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বিল্লমঙ্গলকে বলিলেন কি ঠাকুর! অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে কি হবে, এই প্রসাদ গ্রহণ কর। বিল্লমঙ্গল বুঝিলেন যে, ইনিই সেই ছদ্মবেশধারী পথিক যিনি আমাকে বৃন্দাবনে আনিয়া হস্তনিক্ষেপ করত পলায়ন করিয়াছিলেন। ইনিই সেই ভক্তবৎসল হরি যিনি চিরদিনের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছেন যে " যাহারা অনন্য চিন্তা যুক্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করেন তাহাদের যোগ আর ক্ষেম আমি বহন করি "। অন্ধ বিল্লমঙ্গল মনে মনে আরও ভাবিলেন যে যদি আর একবার নিকটে পাই তবে মনের দুঃখ নিবারণ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিল্লমঙ্গল গোপ বালককে বলিলেন তুমি কে ? একটু অগ্রে আইস আমি অন্ধ দেখিতে পাই না। ছদ্মবেশধারী ভগবান তখন ভক্তের হৃদগত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন এই যে আমি অগ্রে আসিয়াছি। বিল্লমঙ্গল আবার বলিলেন কই আর একটু অগ্রে আইস আমি দেখিতে পাই না। ভগবান বলিলেন এই যে আমি তোমার নিকটেই দণ্ডায়মান আছি। বিল্লমঙ্গল তখন ঠাকুরকে নিকটে পাইয়া দুই বাহু দ্বারায় সজোরে সাপটিয়া ধরিলেন। যেরূপ মণিহারা ফণি মণি পুনঃ প্রাপ্তে শান্তিলাভ করে সেইরূপ অন্ধ বিল্লমঙ্গল অন্ধের যষ্টি স্বরূপ কৃষ্ণনিধিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইলেন। আহা! ভগবানের লীলা কে বুঝিবে ভক্তের সহিত তাঁহার যে নিত্য লীলা হইয়া থাকে তাহা প্রাকৃত চক্ষে কেহই দেখিতে পায় না। আজ তিনি অন্ধ বিল্লমঙ্গলের সহিত প্রকাশ্য ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান যত বলেন অন্ধ! ছাড় ছাড় প্রাণ যায়, বিল্লমঙ্গল ততই প্রাণপণে আরও দৃঢ় করিয়া ধরেন সে এক আশ্চর্য্য ক্রীড়া! আহা! যাঁহাকে যোগীগণ সমাধি অব-

লঙ্ঘন করিয়াও আরম্ভ করিতে পারেন না যিনি বুদ্ধি মনের অগোচর তাঁহাকে আজ অন্ধ বিল্বমঙ্গল কর দ্বারা আবদ্ধ করিল। ধন্য বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ভক্তি ও প্রেম!

পরে ভক্তের অনুরাগে পরম প্রীত হইয়া ভগবান নিজ হস্তে বিল্ব-মঙ্গলকে ভোজন করাইলেন। বিল্বমঙ্গলের তাহাতেও মনের ক্ষোভ মিটিল না তিনি করযোড়ে কহিলেন প্রভো! আমি অন্ধ কিরূপে তোমার নবঘন শ্যামসুন্দর রূপ দেখিব। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু বলিলেন অবশ্য পাইবে এই পদাম্বুজ চক্ষে অর্পণ কর দিব্য চক্ষু হইবে। বিল্বমঙ্গল তখন পরমানন্দে ভগবান প্রদত্ত সেই পদাম্বুজ চক্ষে দিবা মাত্র দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন এবং সম্মুখস্থ ভগবানের মনো-হর রূপ দর্শন করিয়া প্রেমে বিগলিত হইলেন।

এইরূপ ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান অন্তর্দ্ধান হইলেন। ভাবুক বিল্বমঙ্গল সেই মোহনরূপে জীবনাবধি তন্ময় হইয়া রহিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে যথায় বিল্বমঙ্গল সিদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সে স্থানটী অদ্যাবধি একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ হইয়া আছে।

বৎস! এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, বিল্বমঙ্গল যে ভক্তিপথে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার মূল কারণ কেবল সেই বণিক রমণীর অসাধারণ সাধুভাব এবং বেশ্যা চিন্তার সারগর্ভ উপদেশ। অতএব এই সাধুসঙ্গই ভক্তি উৎপত্তির মূল কারণ এবং ইহাই ভক্তি সাধনের উপায় জানিবে এ বিষয় বিশেষরূপে আরও সাধন বিভাগে বলিব। বৎস! তুমি সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ করিও তাহা হইলে ভক্তি স্বভাবতঃ বৃদ্ধি হইবে।

শিষ্য। প্রভো! যে সাধুসঙ্গের বিষয় আপনি এত কীর্ত্তন করিলেন তাহা হওয়া দুষ্কর কারণ প্রকৃত সাধু মিলে না, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য বলুন।

গুরু। বৎস! প্রকৃত সাধু না পাইলে যে শাস্ত্রে ভগবৎ গুণকীর্ত্তিত আছে তাহা শ্রদ্ধাসহ পাঠ করিলেই সাধুসঙ্গ লাভ রূপ ফল হয়। সম্পূর্ণ সাধুভাব না থাকিলেও ভগবৎ গুণকীর্ত্তন বা শ্রবণ কোন লোকের সঙ্গে হইলেও সে সঙ্গসাধু পদবাচ্য। বৎস! সাধু ও সৎকথার প্রসঙ্গমাত্রকেই সাধুসঙ্গ বলা যায়

ভক্তি প্রকরণ।



শিষ্য। প্রভো! ভক্তিপ্রকরণ সম্বন্ধে আমায় কিছু উপদেশ প্রদান করুণ।

গুরু। বৎস! ভক্তি প্রধানত দুই প্রকার (১) সাধনরূপা এবং সাধ্যরূপা। আবার সাধনরূপা ভক্তি দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ গৌণী এবং পরা। আমি ইহাদের বিষয় পৃথক পৃথক করিয়া বলিতেছি।

গৌণী ভক্তি।



যাবতীয় বিধি নিষেধ সাপেক্ষ, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত নিয়ম নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদি গৌণী ভক্তির অন্তর্গত। ইহা দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তি সমুহ পরিশুদ্ধ হয় ও চিত্ত নির্ম্মল হয়। শাস্ত্রে যে সকল দেব দেবীর পূজা পাঠ প্রচলিত আছে বর্ণাশ্রম্ সম্বন্ধে যত প্রকার উপদেশ আছে তাহার নিগূঢ় অভিপ্রায় গৌণীভক্তি সাধন করান। এই ভক্তির চৌষট্টি অঙ্গ যথা:—গুরুপদাশ্রয়, মন্ত্রগ্রহণ, গুরুসেবা, সাধুজনের অনুগমন, ভগবদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, ভোগাদি ত্যাগ, তীর্থস্থানে নিবাস, কথঞ্চিত জীবন ধারণ, উপবাস, অশ্বত্থাদি সম্মাননা, ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ, শিষ্য বৃদ্ধিবর্জ্জন, কার্য্যের আড়ম্বর ত্যাগ, বহুগ্রন্থাদি অভ্যাস বর্জ্জন, লাভালাভে অক্লিষ্টভাব, সেবাদির অবশবর্ত্তিতা, দেবতান্তরে অনবজ্ঞা, ভূতগণের উদ্বেগের কারণ না হওয়া, দেবাপরাধ ত্যাগ, ঈশ্বর এবং তাঁহার ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ নিন্দাদি সহ্য করিতে না পারা, চিহ্ন ধারণ, নৃত্য দণ্ডাবনতি, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, গীত সংকীর্ত্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, আত্মনিবেদন প্রভৃতি ভক্ত্যাঙ্গ সকল সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক। বৎস! যাবতীয় কর্ম্ম উপাসনা যোগ পূজা পাঠ যাহা ঈশ্বরোদ্দেশে কামনা বশতঃ সমাধা করা যায় তাহা সকলই গৌণীভক্তির অন্তর্গত। গীতায় গৌণীভক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা:—(১) আর্ত্ত অর্থাৎ

যাঁহারা দুঃখে পতিত হইয়া দুঃখ নিবারণের জন্য ভগবানকে ডাকে (২) জিজ্ঞাসু অর্থাৎ যাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য গুরু বাক্যে বা শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বিধিপূর্ব্বক কার্য্য করেন (৩) অর্থার্থী অর্থাৎ যিনি নিজের কামনা সিদ্ধির জন্য ভক্তি করেন। উপ রোক্ত ত্রিবিধ ভক্তিই কামনা মূলক এবং বিধি সাপেক্ষ। বৎস! শাস্ত্রে বিধি অনুসারে ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইলেই তাহাকে বৈধীভক্তি বলে, ইহাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান সম্পূর্ণ থাকে, এবং বিধি সাপেক্ষ বলিয়া অতিশয় দুর্ব্বল। তবে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে গৌণী ভক্তিই পরাভক্তির ভিত্তি স্বরূপ এবং ইহা সম্যকরূপে সাধন করিলে আর সাধককে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না। গৌণীভক্তির সাধনে অন্তঃকরণের সমস্ত মলিনতা দূর হয় এবং ইহা দ্বারা অন্তঃ-করণের বৃত্তি সমূহ পরিশুদ্ধ হয় ও দুর্ল্লভ পরাভক্তি প্রকাশিত হয়।

মোট কথা শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সাধকের পক্ষে প্রথমাবস্থায় যত প্রকার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা সকলি এই গৌণীভক্তির অন্তর্গত।

পরাভক্তি ।



বৎস ! সমগ্র সাধন তত্ত্বের চরম ফলকেই পরাভক্তি বলা হয়, ইহাতে কামগন্ধ মাত্র থাকে না। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বলেন যে শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করিতে করিতে লোকের নিষ্ঠা হয়, নিষ্ঠা হইতে গৌণী ভক্তি হয়, গৌণী ভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি দ্বারায় জ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বর দর্শন, সেই ঈশ্বর দর্শন দ্বারা ভগবৎ কৃপাদৃষ্টি লাভ হয় এবং সেই কৃপাদৃষ্টি হইতেই পরা-ভক্তির প্রকাশ হয়। ইহা জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপাকাবস্থা এবং ভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনুভব করিবার উপায় স্বরূপ। বৎস! পরাভক্তি-তেই আমরা জ্ঞান ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখি। পরাভক্তি লাভের প্রকৃত পাত্র কে এ বিষয় গীতায় মীমাংসিত হইয়াছে যথা :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভুতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতেপরাং ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান সম্পন্ন পরমানন্দ পূর্ণ হইয়া শোক দুঃখাদি বিহীন ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলে তবে পরাভক্তি লাভ হয়। গীতায় এই শ্লোকেই প্রকাশ হইতেছে যে, জ্ঞানের পরিপাকাবস্থার নামই পরাভক্তি। ভগবান নিজেই অর্জ্জুনকে গীতায় বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানী যদি আমাকে ভক্তি করেন তিনি আমার বড় প্রিয় হয়েন যথা :—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানো না হ্যত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

অর্থাৎ নিত্যযুক্ত জ্ঞানী যদি ভক্তিবিশিষ্ট হয়েন তাহা হইলে তিনি আমার অতিশয় প্রিয়। বস্তুতঃ জ্ঞানী ভক্তিরসে ডুবিলে বড় সুরসিক ও ভগবানের বড় প্রিয় হয়েন। শুক নারদাদি মহাজন সকল পরাভক্ত। তাঁহারা যেমন একদিগে পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তেমনি অন্যদিগে আ-বার ভক্তেরও চূড়ামণি ছিলেন সেইজন্য ইহারাই পরাভক্তের আদর্শ

স্বরূপ। পরাভক্তি লাভ হইলে জাতি বৈষম্য সম্প্রদায় বিচার বা উপাস্য দেবতার নাম রূপের ভেদভাব জ্ঞান বড় থাকে না। সে অবস্থায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে এক দৃষ্টিতে দেখা যায়। সে অবস্থায় শাক্ত, শৈব, গানপত্য ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতামত লইয়া অনৈক্যতা উপস্থিত হয় না। তখন হয় গৌরী কৃষ্ণ রাধা ও রাম সীতা সকলি একউপাস্য দেবতার ভিতর দেখা যায়, সে অবস্থায় ভক্ত বলেন :—

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি।
যে জন তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজি॥
মগে বলে ফরাতারা, গড বলে ফিরিঙ্গি যারা,
মা খোদা বোলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্ত বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি,
মা সৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকাজী।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ,
মা, শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাজি॥

বৎস! সম্পূর্ণ নিষ্কাম জ্ঞানীর যে ভক্তি তাহাকেই পরাভক্তি বলে। গীতা শাস্ত্রে ভগবান অর্জ্জুনকে এই ভক্তির বিষয় অনেক উপদেশ দিয়াছেন। গীতায় কর্ম্ম, ভক্তি এবং জ্ঞানের বিষয় ভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল উদ্দেশ্য এই পরাভক্তি। এই দুর্লভ ধন লাভ হইলে নানাপ্রকার সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ হয়, যথা—কম্প, কণ্ঠরোধ, রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত ইত্যাদি।

বস্তুতঃ সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ ভক্তের হৃদয়নিধি ভগবান যখন তাঁহার প্রাণের ভক্তকে লইয়া ক্রীড়া করেন তখন যেরূপ তাড়িত যন্ত্র স্পর্শ করিলে শরীরের মধ্যে এক ভয়ানক বৈদ্যুতিক ব্যাপার উপস্থিত হইয়া শরীরকে কম্পিত করে, সেইরূপ জড়দেহে সেই ভগবৎ শক্তি পূর্ণরূপ প্রকাশ হইলে কম্প উপস্থিত হয়। আবার পূর্ণানন্দ স্বরূপ ভগবানের কৃপা লাভ হইলে কণ্ঠ রোধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় ভক্ত মনের উল্লাসে কখন উন্মাদবৎ নৃত্য করেন আবার কখন ভাবে বিভোর হইয়া জড়বৎ পতিত থাকেন। পরাভক্তি সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা এজন্য

ইহাতে শান্ত ও দাস্য রসের অধিক সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এ ভক্তিতে ভগবানকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর জানায় এবং দীনভাবে অতি কাতরে উপাসনা করায়। ভগবানের যত প্রকার যুগল মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় সকল গুলিতেই এই দুর্লভ ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একদিগে যেন প্রেম মন্দাকিনীর নির্ঝরিণীর মন্দ মন্দ গতি, অন্য দিগে জ্ঞানের জ্বলন্তমূর্ত্তি। বৎস! পরাভক্তি জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপাকাবস্থা হইলেও বিশুদ্ধ ভক্তির নিকট অতি সামান্য। এখন তোমাকে সেই বিশুদ্ধ ভক্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি।

———o———

সাধ্যরূপা বা বিশুদ্ধাভক্তি।



বৎস! এই মহাভাবময়ী ভক্তিই সর্ব্বপ্রকার সাধনের চরম ফল ইহাতে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" সেইজন্য বলেন :—

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ সর্ব্বোপাধি ও সর্ব্বৈশ্বর্য্য শূন্য এবং জ্ঞানকর্ম্ম বিহীন যে নির্ম্মল ভগবৎ ভক্তি তাহাই বিশুদ্ধ ভক্তি। আচার্য্যগণ বলেন যে সাধন ভক্তি হইতে ভগবানের উপর রতি উপস্থিত হয় সেই রতি যত গাঢ় হয় ততই বিশুদ্ধ ভক্তি প্রকাশ পায়। সেই রতি দুই প্রকার, একটী ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রা আর একটী কেবলাভেদ রতি। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের মধ্যে সঙ্কোচ ভাব থাকে, এজন্য বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হয় না। কিন্তু কেবলা ভেদে সঙ্কোচ ভাব মাত্র নাই সেইজন্য বিশুদ্ধাভক্তি হইতে প্রেম এবং মহাভাবের উদয় হয়।

বৎস! পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার থাকিলে এবং ভগবানের বিশেষ কৃপা হইলেই বিশুদ্ধাভক্তি লাভ হয়, ইহা সাধ্য ফল এবং অমৃত স্বরূপ। এই ভক্তিতে জ্ঞান বিচার ও ঐশ্বর্য্যভাব মাত্র নাই বলিয়া ভগবানকে সহজ বিশ্বাসের বলে অতি সহজে পাওয়া যায়। ইহাতে ভুক্তি, মুক্তি বাঞ্ছা, জ্ঞানকর্ম্ম ও পূজা পাঠের বড় আড়ম্বর উপস্থিত হয় না। ইহার মূল ভিত্তি সরল বিশ্বাসের উপর। চৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা পরম ভাগবত কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এই ভক্তি সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

"শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধ ভক্তি করয়ে লক্ষণ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম
আনুকূল্য সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন।

এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

ভক্তমাল গ্রন্থেও ঠিক এইরূপ লেখা আছে যথা—

শুদ্ধ ভক্তি বিনে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়।
জ্ঞান কর্ম্ম আদি ত্যজি ভজনে যে শ্রয়॥
ভক্তিরস সুখ সাধ্য আস্বাদন জানি।
কাকে যেন নিম্বফল খায় সুখ মানি॥

বস্তুতঃ অন্য সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ না করিলে এ দুর্লভ ভক্তি লাভ হয় না সেই জন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন:—

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

বৎস! যে পঞ্চরসের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহার মধ্যে বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রসই এই বিশুদ্ধ ভক্তির ভিত্তি ভূমি। এই ত্রিবিধ রসে সঙ্কোচ ভাব এবং বিচার তর্ক কিছুমাত্র নাই কেবল এক সরল বিশ্বাস আর ঐকান্তিক অনুরাগ আছে মাত্র। ইহাতে ভগবানে ও ভক্তে বড় মাকামাকি ভাব দেখা যায় এবং ইহাতে প্রেমানুরাগ পরিপূর্ণ। বৎস! এই ত্রিবিধ রসের মধ্যে মধুর রসই এই বিশুদ্ধ বা সাধ্যরূপা ভক্তির পরিপাক ও সম্পূর্ণ স্ফূরণ হইয়াছে জানিবে। ব্রজলীলায় ইহার প্রকাশ, শ্রীবৃন্দাবনধামই ইহার অভিনয়ক্ষেত্র, শ্রীরাধিকা ইহার নায়িকা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহার নায়ক।

শ্রীরাধিকার বিশুদ্ধাভক্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতদূর বশীভূত হইয়াছিলেন যে, এক সময় তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল:—

"স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডলং দেহি পদ পল্লব মুদারং।"

অর্থাৎ স্মরগরলের খণ্ডনকারী তোমার এই উদার পদ পল্লব আমার মস্তকে প্রদান কর, ইহা আমার শিরদেশের ভূষণ স্বরূপ হউক। আহা! সরল প্রেমের এই লক্ষণ, ইহাই ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বিহীন বিশুদ্ধ ভক্তি, নতুবা শ্রীকৃষ্ণ কেনই বা বলিবেন:—

"প্রিয়া যদি মানকরি করয়ে ভৎসন, বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরেমোর মন"

শিষ্য। প্রভো! আপনি মধুর রসই সাধ্যরূপা বা বিশুদ্ধাভক্তির চরম সাধন বলিয়া ব্রজগোপিকাদিগকে উপমা দিলেন; কিন্তু বাৎসল্য ও সখ্য রসের আদর্শ সাধক কাহারা ছিলেন বলুন।

গুরু। বৎস! নন্দ, যশোদা, কৌশল্যা, দশরথ কশ্যপ, প্রভৃতি ভক্তগণ ভগবানকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া এবং আত্মজের ন্যায় লালন পালন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। সখ্য রসের ভক্ত যথা:—

অর্জ্জুন, উদ্ধব, সুবল শ্রীদামাদি গোপ বালকগণ ইহাঁরা ভগবানকে সরল বিশ্বাসের সহিত আপনার মত ভাবিতেন।

শিষ্য। প্রভো! আপনি বলিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ ভক্তিতে ঐশ্বর্য্য ভাব মাত্র নাই কিন্তু সখ্য বা বাৎসল্য কিম্বা মধুর রসের যে সকল ভক্তের নাম করিলেন ইহাঁদের কি কখন ঐশ্বর্য্য ভাব উদয় হইত না?

গুরু। বৎস! ইহাঁদেরও ঐশ্বর্য্য জ্ঞান উদয় হইত, সে সময় তাঁহারা বাৎসল্য ও মধুর রসের যে পরমানন্দ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেন। গীতায় দেখা যায় যখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাব উদয় হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

সখেতিমত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং তৎক্ষাময়েত্বামহম প্রমেয়ং॥

অর্থাৎ তোমার মহিমা না জানিয়া অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে কখন সখা বলিয়া কখন যাদব বলিয়া কখন কৃষ্ণ বলিয়া কত কি বলিয়াছি তাহার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। ভগবান অর্জ্জুনের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়ে সখ্যভাব উদ্দীপনা করিয়াছিলেন। বৎস! সখ্য, বাৎসল্যে ও মধুর রসে যে পরমানন্দ লাভ হয় তাহা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে লাভ হয় না কারণ সচরাচর দেখা যায় মায়ামোহে অভিভূত হইয়া প্রিয় বন্ধু বা পুত্র কন্যা অথবা স্বামী স্ত্রীতে যেরূপ অনুরাগ হয় সেরূপ অন্য কিছুতে হয় না। যদি ঐরূপ অনুরাগ ভগবানের উপর উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আর কিছুই বাঁকি থাকে না। এইজন্য সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের যে সকল ভক্ত তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ ভক্ত জানিবে, তাঁহারা সাধক অবস্থা হইতে সিদ্ধাবস্থায় পৌঁছিয়াছেন।

বৎস! আমি তোমার নিকট একটি ভক্তের চরিত্র বলিতেছি ইহা শুনিলে বুঝিতে পারিবে যে, যাঁহারা ভগবানের সহিত উপরোক্ত ত্রিবিধ রসের কোন একটি রস দ্বারায় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন তাঁহারা এ রাজ্যের লোক নহেন এবং স্থূল চক্ষে দেখিলে তাঁহাদের অন্ত পাওয়া যায় না। ভগবান সেইরূপ ভক্তের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিয়া আনন্দিত হয়েন এবং সদাকাল সেই ভক্তের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া থাকেন। ভক্তের কোন কষ্ট বা দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাতে ভক্তের অনুরাগ বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় না বরং আরও বৃদ্ধি হয়। ভগবান সেইজন্য ভক্তকে কষ্ট দিয়া জগৎকে দেখান যে, কষ্টে দুঃখে পড়িয়া যাঁহারা ভীত না হয়েন, ভগবানকে ভুলিয়া না যান, তাঁহারাই প্রিয় ভক্ত।

——০——

জগন্নাথ মাধব দাস।



জগন্নাথ মাধবদাস নীলাচলের কোন একটি ক্ষুদ্র পল্লিতে বাস করিতেন। বাল্যকাল হইতেই জগন্নাথের সহিত তাঁহার সখ্য ভাব উদয় হইয়াছিল সেই সৌহার্দ্দ ভাব ক্রমে এতদূর বৃদ্ধি হয়, যে পরে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করতঃ তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে বাস করেন। তথায় তিনি প্রথমতঃ অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিবসত্রয় অনাহারে পতিত থাকেন কেহই কিছু দেয় নাই কিন্তু ভক্তের দুঃখ চিরদিন দুঃখী ভক্তের জন্য বৈকুণ্ঠের বৈভব পরিত্যাগ করেন সেই দয়াল জগন্নাথ সাধু মাধব দাসের অনাহার কষ্টে প্রপীড়িত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি স্বর্ণ থালাতে সাজাইয়া লক্ষীকে বলিলেন তুমি সত্বর এই প্রসাদ মাধবদাসকে দিয়া আইস। ত্রৈলোক্য সুন্দরী জগৎমাতা লক্ষী দেবী প্রভুর আদেশমাত্র প্রসাদ লইয়া যথায় ভক্ত মাধব দাস অনাহারে অন্নকষ্টে দীনভাবে পতিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং প্রসাদ রাখিয়া বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর্দ্ধ্যান করিলেন। ভগবানের লীলা বুঝিতে ভক্তের বড় অধিক দেরি হয় না, মাধব জানিলেন যে, এ সকল জগন্নাথের লীলা। তখন ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

পর দিবস জগন্নাথের পাণ্ডাগণ স্বর্ণথালি দেখিতে না পাইয়া মহা গণ্ডগোল আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে লোকজন অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কেহই ঠিক করিতে পারে না। পরে প্রকাশ হইল যে, স্বর্ণথালি মাধবদাসের নিকট আছে। পাণ্ডাগণ তখন মাধব দাসের নিকট যাইয়া দেখে যে সত্য সত্যই স্বর্ণথালি তথায় পতিত রহিয়াছে। সকলেই স্থির করিল যে মাধবদাস নিশ্চয়ই চুরী করিয়াছিল নতুবা স্বর্ণথালি সেখানে কেন আসিবে। হা ভগবান! তোমার লীলা কে বুঝিবে তোমার ভক্তদিগকে যে তুমি বিপদে ফেল সে কেবল তাহাদের মাহাত্ম দেখাইবার জন্য! মূঢ়মতি পাণ্ডাগণ মাধবদাসকে চোর সাব্যস্থ করিয়া

বেত্রাঘাত আরম্ভ করিল। চোরের মার কে না জানে কেহ মারিতে ত্রুটি করিল না কিন্তু দীন মাধবদাস অবণত মস্তকে তাহা সহ্য করিলেন একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না যে তাঁহারা কেন তাঁহাকে মারিতেছেন। মাধবদাসকে পাণ্ডাগণ প্রহার করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল কিন্তু মাধব একবারও কষ্ট প্রকাশ করিলেন না যেন কে কারে মারিতেছে। এ দিগে দীনবৎসল জগন্নাথ ভক্তের উপর অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া সত্বর পাণ্ডাদিগকে আদেশবাণী দ্বারায় বলিলেন নির্ব্বোধ! তোরা যে মাধবদাসকে স্বর্ণথালির জন্য এত প্রহার করিতেছেন সে থালি যে আমিই তাহাকে দিয়া আসিয়াছি, আর তোরা যে উহাকে এত প্রহার করিলি সে প্রহার যে সকলি আমারই অঙ্গে লাগিয়াছে। এই দেখ্ আমার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, অনবরত রুধির ধারা নির্গত হইতেছে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না। আদেশবাণী শুনিবামাত্র পাণ্ডাগণ স্তম্ভিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীমন্দিরে যাইয়া দেখিলেন যে, জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ হইতে সত্য সত্যই অনবরত রুধির ধারা বিনির্গত হইতেছে এবং শ্রীঅঙ্গ প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া পাণ্ডাগণ মূর্চ্ছিত হইল। পরে সকলেরই মনে হইল যে হায় হায়! মাধব দাসকে প্রহার করিয়া তাহারা কি ভয়ানক অপরাধই করিয়াছে। সকলেই তখন মাধব দাসের পদ প্রান্তে পতিত হইয়া বহু স্তব স্তুতি দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

এক সময় মাধব দাসের ভয়ানক আমাশার পীড়া হয়। রোগ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাঁহার জল আনিবার ক্ষমতাও ছিল না, তিনি সেইজন্য জলের নিকট বালুর উপর পতিত রহিলেন। আহা! ভক্তের কষ্টে ব্যথিত হইয়া ভগবান কি সুস্থির থাকিতে পারেন! জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ একটি বালকের রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অনবরত সাধুর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, যেন একজন অনুগত ভৃত্য। আহা ধন্য ভক্তবৎসলতা! মাধবদাস একটু সুস্থ হইয়া দেখেন জগন্নাথ নিজেই তাঁহাকে জল দিতেছেন। তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, হায় হায়! তোমার একি কর্ম্ম? তুমি রত্ন সিংহা-

সনে বসিবে লক্ষ লক্ষ দাস দাসীতে তোমার শুশ্রুষা করিবে না তুমি এই জঘন্য কার্য্য করিতেছ! জগন্নাথ বলিলেন মাধব! আমি তোমার সেবা করিতে বড় আনন্দ বোধ করি।

মাধবদাস এইরূপ কতক দিবস জগন্নাথক্ষেত্রে বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে একদিন তাঁহার একজন শিষ্যের বাটীতে অবস্থান করেন। শিষ্যের স্ত্রী অতি ভক্তিমতি ছিল, সে গুরুর যথোচিত সেবা করিয়াছিল। পর দিবস মাধব যখন পুনরায় বৃন্দাবনযাত্রা করিলেন তখন সেই ভাগ্যবতী স্ত্রী দেখিল যে গুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি সুন্দর সুঠাম কিশোর শ্যামবর্ণ বালক গমন করিতেছেন। সুকুমার বালকের অপরূপ লাবণ্য ও সুন্দর্য্যতা দেখিয়া, স্ত্রী গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো! আপনার সঙ্গে যে বালকটি যাইতেছেন ইনি কে? আহা! এমন সুন্দর রূপ ত কখন দেখি নাই—উঃ! আপনি কিরূপে ইহাকে এত পথ হাঁটাইয়া লইয়া যাইবেন। তাহার কথা শুনিয়া মাধবদাস বুঝিলেন যে আর কেহ নহে—জগন্নাথ। কিন্তু শিষ্যের স্ত্রীর নিকট সে কথা প্রকাশ না করিয়া—বলিলেন তুমি বোধহয় আর কাহাকে দেখিয়াছ আমার সহিত কেহই নাই তুমি ফিরিয়া যাও। স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া যাইল বটে কিন্তু তাহার মন গুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ধাবিত হইল। ধন্য সেই স্ত্রীরত্ন! যিনি প্রত্যক্ষ জগন্নাথের শ্রীমুর্ত্তি দর্শন করিলেন।

মাধবদাস কিছু দিবস পরে শ্রীবৃন্দাবনধামে পৌছিলেন। তথায় পৌছিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ঠাকুর দর্শন করিয়া তিনি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। নিধুবনে শ্রীমান বঙ্কুবিহারীর অপরূপ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। নানা স্থানে নানা বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বেড়াইতে প্রথম দিবস তাঁহার আদৌ আহার হইল না। পর দিবস আবেশে বিহ্বল হইয়া যমুনার তীরে বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন লোক কতকগুলা চানা ভাজা আনিয়া তাঁহাকে আহার করিতে দিল। সাধুর অন্তঃকরণে সদাই আনন্দ, মাধব দাস সেই চানাভাজা বঙ্কবিহারীকে নিবেদন করিয়া পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

আহা! আশ্চর্য্য ভগবানের লীলা, আশ্চর্য্য তাঁহার কৌশল। তাঁহার প্রিয় সখা মাধব দাস উপবাসী আছেন এ দুঃখ কি তাঁহার সহ্য হয়! তাহার ভক্ত চানাভাজা খাইয়া রহিল তিনি কি আর দেবভোগ আহার করিতে পারেন! হরিদাসস্বামী প্রত্যহ যেরূপ ভোগ দিয়া থাকেন সে দিনও সেইরূপ দিলেন কিন্তু অন্য দিন স্বামীজী যেরূপ ভোজন চিহ্ন দেখিতে পান সে দিন সেরূপ না দেখিয়া অতি কাতরে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! অদ্য কি ভোগে কোন বিঘ্ন হইয়াছে? আপনি আহার করিলেন না কেন? বেহারিজী কহিলেন আমার আজ ক্ষুধা নাই। একজন জগন্নাথী বাবাজী আমাকে যে অপূর্ব্ব চানাভাজা খাওয়াইয়াছেন তাহাতেই আমার উদর পূর্ণ হইয়াছে। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে জগন্নাথী বাবাজী বড় সহজ লোক নহেন। তিনি সত্বর একজন চেলাকে সেই বাবাজীকে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। চেলা আদেশমাত্র অনুসন্ধান করিয়া যথায় মাধব দাস আবেশে বিহ্বল হইয়া পতিতছিলেন তথায় উপস্থিত হওতঃ অতি বিনয় করিয়া সাধুকে বেহারিজীর মন্দিরে লইয়া আসিলেন। হরিদাসস্বামী সাধুকে দর্শনমাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ করযোড়ে বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন প্রভো! আপনিই ধন্য! আপনার অপূর্ব্ব চানাভাজায় আজ বেহারিজী পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। ঐ দেখুন ভোগের দ্রব্যাদি সকলি পড়িয়া আছে উনি কিছুই স্পর্শ করেন নাই। মাধবদাস বেহারিজীর উপবাসের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং লজ্জায় অবনত হইয়া ভাবিলেন, হায়! হায়! যাঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষীরসর নবনীত ভোগ দেয় তাঁহাকে আজ আমি কি না ছানা ভাজা ভোগ দিয়াছি! এই বলিয়া সাধু অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী মাধবদাসকে অতি ভক্তি পুরঃসর ভোজন করাইলেন এবং বিশেষ যত্নপূর্ব্বক কিছু দিন তথায় রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করিলেন।

আহা! ভক্তের চরিত্রে কত অদ্ভুৎ ব্যাপারিই দেখা যায়। মাধব দাস স্বামীহরিদাসের যত্নে কিছু দিবস বেহারিজীর মন্দীরে অবস্থান

করিয়া পরে ভাণ্ডির বন দেখিবার জন্য গমন করিলেন। তথায় একটী টিলার উপর একজন ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। ব্রহ্মচারীর অনেক জিনিসপত্র সংগ্রহ ছিল কিন্তু কাহাকে কিছু দিতেন না, অতিথি যাইলে জিজ্ঞাসা করিতেন না। সাধু মাধবদাস দুই এক দিবস তথায় রহিলেন কিন্তু ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসাও করিল না। পরে যাই সাধু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন অমনি ব্রহ্মচারীর সকল দ্রব্যাদিকীটে পরিপূর্ণ হইল। সে যেন এক ঐন্দ্রজালিত ব্যাপার! ব্রহ্মচারী দ্রব্যাদিতে কীটপূর্ণ দেখিয়া ব্যাকুলভাবে দৌড়িয়া মাধবদাসের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন, প্রভো! আমার অপরাধ ক্ষমা করুণ, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেবা গ্রহণ করুন। মাধবদাস বলিলেন তোমার কথা শুনিতে পারি যদি তুমি সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া হরিনাম সার করিতে পার। ব্রহ্মচারী তাহাই স্বীকার করিল। আহা! ধন্য সাধুসঙ্গের প্রভাব, ধন্য ভক্তের মহিমা। ব্রহ্মচারী সকল জিনিসপত্র গরীব দুঃখীকে দিয়া ফকির হইলেন।

মাধবদাস ক্রমে বৃন্দাবনের সর্ব্বস্থান দর্শন করিয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। পথিমধ্যে একদিন এক শিষ্যের বাটীতে রহিলেন, তথায় গ্রামের যাবতীয় লোক আসিয়া সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্ত্তন করিত। তাহাদের হরিপ্রেমে উৎসাহিত দেখিয়া তিনি কিছু দিবস পর্য্যন্ত তথায় সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন। অবশেষে পথে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে সাধু মাধবদাস নীলাচলে পৌঁছিয়া অবশিষ্টকাল জগন্নাথের নিকট অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদা মাঘমাসের শীতে মাধবদাস পুরীর মধ্যে রজনীযোগে নিদ্রিত আছেন, গাত্রে আচ্ছাদনমাত্র ছিল না এজন্য দয়াল শ্রীজগন্নাথ তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে বহুমূল্য সাল ভক্তের গাত্রে প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাতে পাণ্ডাগণ ও অপরাপর লোক সকল দেখিল যে, প্রভুর অমূল্য শীত বস্ত্র মাধবদাসের গাত্রে রহিয়াছে। সকলেই মাধব দাসের মাহাত্ম্য অবগত ছিল এজন্য স্থির করিল দয়াল জগন্নাথ ভক্তের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সাল খানি গাত্রে দিয়া দিয়াছেন।

কিছু দিবস পর্য্যন্ত এইরূপে সাধু মাধবদাস অতিবাহিত করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার অমানুষিক জীবনক্ষেত্রে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সামান্য বুদ্ধিতে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বিশ্বাসীর চক্ষে সেগুলি প্রত্যক্ষ ঘটনা।

বৎস! মাধবদাসের চরিত্রের এইটিই সারসংগ্রহ যে তিনি জগন্নাথকে কখন ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দেখিতেন না, তিনি তাঁহাকে প্রিয় সখা বলিয়া জানিতেন। তাঁহার সরল বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ ভক্তিতে জগন্নাথ আবদ্ধ ছিলেন সেইজন্য তাঁহার সেবা করিতে পরমানন্দ বোধ করিতেন। বৎস! তোমাকে ত্রিবিধ ভক্তির বিষয়ই কিছু কিছু আভাস দিলাম এখন আর কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহ বল।

জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য।



ভক্ত্যা-জ্ঞানাতীতি চেন্নাভিজ্ঞপ্ত্যা সাহায্যাৎ।

শিষ্য। প্রভো! আপনার মুখে ভক্তি উপদেশ শুনিয়া বোধ হইতেছে—যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরম শান্তিস্বরূপ, কিন্তু আবার জ্ঞানীর মুখে জ্ঞানের প্রশংসা শুনিলে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় অতএব এ উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কি তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য বড় সূক্ষ্ম আমি এ সম্বন্ধে ভক্তিআচার্য্যদিগের যে সিদ্ধান্ত তাহার কিছু আভাস দিতেছি।

জ্ঞান শব্দে জানা বুঝায় অর্থাৎ " জ্ঞেয় স্বরূপ ব্রহ্মকে জানা।" আর ভক্তির অর্থ পূর্ব্বেই বলিয়াছি " ঐকান্তিক অনুরাগ "। এখন পার্থক্য দেখিতে হইলে সহজে বুঝা যায় যে একটী (জ্ঞানে) ব্রহ্মকে জানিবার উপায় আর একটীতে (ভক্তিকে) সেই ব্রহ্মকে ঐকান্তিক অনুরাগ দেখান।

বৎস! ভগবান শাণ্ডিল্য ঋষির মতে জ্ঞানের দ্বারায় ভগবানকে জানিলে বা তাঁহাকে দর্শন করিলেও সাধকে ও ভগবানে ব্যবধান থাকে। তিনি বলেন " দর্শন ফলমিতি চেন্নতেন ব্যবধানাৎ " অর্থাৎ দর্শন করিলেই ফল হয় না কারণ তাহাতেও ব্যবধান থাকে। বস্তুতঃ ভগবদ্দর্শন ও তৎজনিত আনন্দ আস্বাদন এ দুইটী পৃথক বস্তু। ঋষি শাণ্ডিল্য আবার উপরোক্ত সূত্রটী আরও পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে পরেই বলিয়াছেন " দৃষ্টত্বাচ্চ " অর্থাৎ এরূপ সাধারণতঃ দেখাও যায় যে প্রথমে একটী কোন সুন্দর পদার্থ দর্শন করিবামাত্র তাহার উপর অনুরাগ বা প্রীতি হয় না। যত সেই পদার্থের মনোহারিত্ব ও সৌন্দর্য্য ক্রমে মনে উদিত হয় তত অনুরাগ ও প্রীতির প্রকাশ হয়। অতএব এ অবস্থায় ভক্তিকে জ্ঞানের ফল বলিতে হইবে। বৎস! এখন বুঝিতে পারিবে যে অজ্ঞ লোকেরাই বলিয়া থাকে ভক্তি হইতেই জ্ঞান হয়। শাণ্ডিল্য সে সন্দেহ দূর করিয়া বলিয়াছেন " ভক্ত্যা

জ্ঞানাতীতি চেন্নাভিজ্ঞপ্ত্যা সাহায্যাৎ ” অর্থাৎ যখন জ্ঞান, ভক্তির সহায়তা করিয়া থাকে তখন ভক্তি হইতে জ্ঞান হয় একথা ভুল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জ্ঞানের দ্বারায় ভগবানকে জানিতে পারা যায় তৎপরে ভক্তির সঞ্চার হয়। ভগবান শাণ্ডিল্য সেই জন্য ভক্তিকে মুখ্য বলিয়াছেন যথা—“সা মুখ্যেতরা পেক্ষিতত্বাৎ” অর্থাৎ ভক্তিই মুখ্য কারণ সর্ব্বসাধনেই ইহার সাহায্য আবশ্যক হয়।

বৎস! দেবর্ষি নারদেরও মত এই যে, ভক্তি সর্ব্ব সাধনের ফল স্বরূপ, তাঁহার “ওঁ ফলরূপত্বাৎ” এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে ভক্তিই জ্ঞানাদি সর্ব্ব সাধনার ফল। এ কথা যে সন্দেহ বিহীন তাহার প্রমাণ গীতায় ভগবদুক্তি যথা—

ব্রহ্ম ভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাং॥

অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহার পর পরাভক্তি লাভ হয়। অতএব বৎস! জ্ঞান ও ভক্তির সাধারণ পার্থক্য এই যে, জ্ঞান দ্বারায় ভগবানকে জানা যায় ও বুঝা যায়, কিন্তু ভক্তি সেই জানার ফল স্বরূপ অথবা ইহা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের “আনন্দ” ভোগ করিবার একমাত্র উপায় স্বরূপ।

শিষ্য। প্রভো! যাহাকে সাধারণতঃ লোকে শ্রদ্ধা বলে তাহাই কি ভক্তি না শ্রদ্ধা ভক্তিতে কিছু পার্থক্য আছে।

গুরু। বৎস! ভক্তি শ্রদ্ধার ন্যায় নহে। শাণ্ডিল্য ঋষি “নৈব শ্রদ্ধাতু সাধারণ্যাৎ” এই সূত্রে এ বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দেখা যায় কিন্তু ভক্তি ভগবান ভিন্ন অন্য কিছুই লক্ষ্য করে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে একতা সম্পাদন করিলে অনবস্থা দোষ ঘটিয়া থাকে। যথা—“তস্যাংতত্ত্বে চানবস্থানাৎ” অতএব ভক্তিকে কখনই শ্রদ্ধার ন্যায় ভাবিবে না ইহা সর্ব্বসাধনার শেষ ফল ও ঐকান্তিক অনুরাগ স্বরূপ।

শিষ্য। প্রভো! জ্ঞান ও ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য কি একই না মতান্তর, যদি মতান্তর হয় তাহা হইলে কিরূপ?

গুরু। বৎস! ইহাদিগের সাধন প্রণালী ও সিদ্ধ ফল উভয়ই সতন্ত্র। সাধন সম্বন্ধে যে পার্থক্য আছে তাহা আমি তোমাকে সাধন বিভাগে বলিব এখন সাধারণতঃ এ উভয়ের কিরূপ ভেদাভেদ আছে তাহা বলিতেছি।

বৎস! বেদান্ত মতে পরমাত্মাতে ও জীবাত্মাতে অভেদ জ্ঞান হইলে নির্ব্বাণ মুক্তি হয় অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে যে অহং জ্ঞান তাহা ভ্রম বিবেচনা করতঃ "অহং ব্রহ্মাস্মি" "প্রজ্ঞান ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" বা 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি যে বেদোক্ত মহাবাক্য সকল আছে তাহার কোন একটী চিন্তা করিতে করিতে সম্যক জ্ঞান হইলেই জীব ব্রহ্মে লীন হইতে পারে। এ মুক্তি লাভ হইলে আর মায়াময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

বৎস। এই নির্ব্বান মুক্তি ছাড়া আর চারি প্রকার মুক্তি আছে যথা—সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য ও সারূপ্য। ইহাদের উদ্দেশ্যও সতন্ত্র যথা—সার্ষ্টি মুক্তিতে ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করা, সালোক্য মুক্তিতে ভগবানের সহিত এক লোকে বাস লাভ করা, সামীপ্য মুক্তিতে ভগবানের নিকটস্থ হওয়া এবং সারূপ্য অর্থাৎ ভগবানের সমান রূপত্ব প্রাপ্ত হওয়া। এই সকল মুক্তি জ্ঞান যোগাদি সাধনে লাভ হয় এবং ইহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়েও শাস্ত্রে অনেক কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৎস! ভক্তিতে এ গুলি তুচ্ছ জ্ঞান করে। ভক্তকে মুক্তি চতুষ্টয় দিলেও গ্রহণ করেন না কারণ তাঁহার লক্ষ ভগবৎ সেবা। সেইজন্য কপিলদেব বলিয়াছেন যথা—

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্ব মপ্যুত।
দীয়মান ন গৃহন্তি বিনামৎ সেবনং জনাঃ ॥

অর্থাৎ ভক্তকে মুক্তি চতুষ্টয় দিলেও তিনি আমার সেবা ভিন্ন আর কিছুই চাহেন না।

বৎস! ভক্তি আচার্য্যগণ বলেন যে জীব ভগবানের নিত্য দাস এইটিই ভগবানের সহিত ভক্তের সনাতন "সম্বন্ধ"। ভক্তি ভিন্ন সেই সনাতন পুরুষ ভগবানকে লাভ করা যায় না এজন্য ভক্তিকে "অভিধেও" বলা

হয়। জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রেম লাভ করা সেইজন্য প্রেমকে "প্রয়োজন" বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আচার্য্যগণের এই সিদ্ধান্ত যে ভগবান যখন জীবের নিত্য প্রভু এবং জীব তাঁহার নিত্য দাস, তখন ভক্ত কখনই ভগবানের সহিত একাত্মতা স্পৃহা করিবেন না। তিনি চিরদিন ভগবৎ সেবায় নিমগ্ন থাকিবেন ইহাই তাঁহার ব্রত।

বৎস! ভক্তের এই বৃত্তি সম্বন্ধে ভগবান কপিলদেব স্বীয় মাতা দেবহুতিকে আরও বলিয়াছেন :—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎ পাদসেবাভিরতা মদীহাঃ যে নন্যতো ভাগবতাঃ প্রসন্য সভা জয়ন্তে মম পৌরুষানি। অর্থাৎ হে মাত! যাহারা আমার পাদ সেবায় অনুরক্ত, যাঁহাদের আমার নিমিত্তই সমস্ত চেষ্টা, যাঁহারা আমার বীর্য্য বর্ণনা করাই পরম পুরুষর্থজ্ঞান করেন। এমম্বিধ ভক্ত আমার সহিত একাত্মতা প্রার্থনা করেন না।

বৎস! নির্ব্বান মুক্তি যে ভক্তের প্রার্থনীয় নহে তাহা ভক্তরাম প্রসাদের এই পদটিতে বড় পরিস্কার রূপে প্রকাশ হয় যথা—

কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূল ভক্তি মুক্তি হয় মন তার দাসী।
নির্ব্বানে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় (মন) চিনি খেতে ভালবাসী॥

আবার ভক্ত ভগবৎ সেবা ভিন্ন ভোগৈশ্বর্য্যাদি প্রার্থনা না করিলেও ভক্তবৎসল ভগবান তাহা ভক্তকে না দিয়া থাকিতেই পারেন না। ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে ভগবান কপিলদেব দেবহুতিকে বলিয়াছেন—

অথোবিভুতিং মম মায়য়া বিরচিতামৈশ্বর্য্য মষ্টাঙ্গমনু প্রবৃত্তং।
শ্রিয়ং ভাগবতীম্বা ন স্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং পরস্য মে তেহশ্নুবতে নুলোকে॥

অর্থাৎ আমার ভক্তগণকে যে মুক্তি প্রদান করি তাহাতে বিভূতিও অধিক আছে। আমর ভক্তগণ অবিদ্যা নিবৃত্তির পর আমার মায়া বিরচিত সত্য লোকাদি, ও ভোগ সম্পত্তি এবং ভক্তির পশ্চাৎ স্বয়ং উপস্থিত অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য তথা ভাগবতী শ্রী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থ সাষ্টিনাম্নী সম্পত্তি ও ব্রহ্মানন্দ সুখ এই সকল ভোগ অভিলাষ না করিলেও বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেই অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েন।

শিষ্য। আপনার কথায় আমার সন্দেহ দূর হয় নাই। নির্ব্বাণ মুক্তির জন্যই যাবতীয় লোক অস্থির ইহার দ্বারায় জনমমরণ রূপ সংসার গতি নিবৃত্তি হয়, অতএব ইহা অপেক্ষাও আপনি বৈকুণ্ঠবাস শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, তবে কি বৈকুণ্ঠে বাস হইলে জীবকে আর সংসারে পুনরায় আসিতে হয় না? তবে যে অনেকের মুখে শুনিয়াছি স্বর্গাদি সুখ কেবল অল্প দিবসের জন্য, প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেং পুনরায় সংসারে আসিতে হয়?

গুরু। বৎস! স্বর্গাদি বাসের ন্যায় বৈকুণ্ঠ লোক স্থিত ভোক্তা ও ভোগ্য সকলের কাল বশতঃ ক্ষয় হয় না। যাঁহারা ভগবানের ভক্ত তাঁহারা অমর হয়েন এবং কোন কালে আনন্দভোগ হইতে বঞ্চিত হয়েন না। যথা—ভাগবতে—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি নোমেহনিমিষো লেঢিহেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখাগুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং॥

অর্থাৎ আমার ভক্তকে আমি যে মুক্তি প্রদান করি তাহাতে তাহারা কোন কালে ভোগৈশ্বর্য্যাদি বিহীন হয় না এবং তাহারা কদাপি স্বর্গাদি ভোগের ন্যায় কাল বশতঃ ক্ষয় হয় না এবং তাহাদের কখন আমার অনিমিষ কালচক্র বিনাস করিতে পারে না। অতএব বৎস! তুমি বৈকুণ্ঠ বাসরূপ নিত্য সুখের সহিত যে স্বর্গসুখের তুলনা করিতেছিলে তাহা ভ্রম। বৎস! জ্ঞানী সংসার গতি হইতে উদ্ধার হইবার জন্য যে নির্ব্বাণ মোক্ষের প্রার্থনা করেন তাহা ভক্তের চক্ষে বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হয়। ভক্ত বলেন সংসারগতি হইতে উদ্ধার হইলে সংসারের সার বস্তু সেই ভগবানের বিষয় কিছুই জানা হয় না। বস্তুতঃ যদি নির্ব্বাণ মুক্তি হয় তাহা হইলে ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ থাকে না। যে সংসারে জীব অনাদিকাল হইতে নানাবেশে নটের ন্যায় অভিনয় করে তাহার নিয়ন্তা স্বরূপ সনাতন পুরুষ ভগবানের আনন্দ স্বরূপ আস্বাদন করা হয় না। অতএব নিত্যকাল তাঁহার নিত্যধামে বাসকরতঃ তাঁহার নিত্য আনন্দসুখ ভোগ করাই পরম পুরুষার্থ।

শিষ্য। প্রভো! ভক্তিতে যদি মুক্তি প্রার্থনীয় না হয়, তাহা হইলে এমন কি বস্তু লাভ হয় যাহা মোক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?

গুরু। বৎস! যাঁহারা ভগবানকে ভক্তি দ্বারা ভজনা করেন, তাঁহারা ইহকালে দুঃখময় সংসারের অভ্যন্তরে সদাকাল শান্তি লাভ করেন, পরকালে চির কৈবল্যানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। এই কৈবল্যানন্দ ধামকেই শৈবগণ রুদ্রলোক ও বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া থাকেন। বৎস! এই আনন্দধামে গমন করিলে মায়া বিরচিত সংসারে আর পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তির গুণে লিঙ্গাদি শরীর বিনষ্ট হইয়া যায় এজন্য ভক্তের আর পুনরায় জন্ম হয় না।

শিষ্য। জ্ঞানে যেরূপ সাধন দ্বারা চিত্ত সংযমন হয় ভক্তিতে সেরূপ হয় না, অতএব ভক্তের মরণকালে ভগবৎ স্মৃতি বিনষ্ট হইবার সম্ভব, এ অবস্থায় ভক্তি সাধন করিতে করিতে যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলে ত অধঃপতন হইবার সম্ভব ?

গুরু। বৎস! শাস্ত্রে এরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভক্তি সাধন করিতে করিতে যদি মৃত্যুকালে ভগবানের নাম রূপ স্মরণ না হয় তাহা হইলে ভগবৎ কৃপায় তাহার অধঃপতন হয় না। ভগবান কৃপা করিয়া নিজ ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভাব হওত ভক্তকে সংসারসাগর পার করিয়া দেন। বৎস! যখন ভক্তের ভার ভগবানের উপর তখন ভগবান ভক্তগণের সমস্ত অভাব ও দুঃখ মোচন করিয়া জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মবীজস্বরূপিনী অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়াদেন, ইহাই তাঁহার ভক্ত বৎসলতা।

বৎস! জ্ঞান ভক্তি সম্বন্ধে আরও যে সকল পার্থক্য আছে তাহা কিছু কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর।

জ্ঞানে প্রারব্ধ ভোগ স্বীকার করে, কিন্তু ভক্তিতে বলে ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত ভগবানের নাম করিলে প্রারব্ধাদি আপনা আপনি বিনষ্ট হয়।

জ্ঞানে সর্ব্ব বিষয়েরই অধ্যাত্ম ভাব গ্রহণ করে, কিন্তু ভক্তি অধ্যাত্মের কথা শুনিলে কুণ্ঠিত হয়, ইহাতে স্থূল বিগ্রহ মূর্ত্তির সেবা চায়।

জ্ঞানে জগৎ মিথ্যা বলিবে ভক্তিতে তাহা স্বীকার করে না, জ্ঞানে বলিবে নামরূপ মিথ্যা; ভক্তির নামরূপই সর্ব্বস্ব।

জ্ঞানীর মুক্তি সাধন পৌরুষাভিমানে নিজের উপর, কিন্তু ভক্তের পক্ষে পৌরুষভিমান অধঃপতনের কারণ, তাঁহার সমস্ত ভার ভগবানের উপর। যেরূপ শৈশব বালকের যাবতীয় ভার পিতার উপর, সেইরূপ ভক্তের সমস্ত ভার ভগবানের উপর ন্যস্ত। ভক্ত নিজের সুখের জন্য কিছুই করেন না এবং ভাবেন না। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ও সার ব্রত ভগবৎ সেবা, সেইজন্য ভক্তবৎসল ভগবানও তাঁহাদের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৎস! জ্ঞানী যেথানে বলিবেন—অহংস্ব অর্থাৎ "আমিই সেই ব্রহ্ম" অথবা "ভগবান আর আমি এক" সেথানে ভক্ত বলিবেন তদ্দাস দাস দাসানং দাসত্বং দেহিমে প্রভো, অর্থাৎ হে প্রভো! আমাকে তোমার দাসের দাস তাহার দাসত্ব প্রদান কর।

বৎস! ভক্তবৎসল ভগবান এই জগতে দুইটী মহাভূত হইতে দুইটী মহৎ সত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন দেখা যায় অর্থাৎ অগ্নি দ্বারায় জ্ঞানের এবং জলের দ্বারায় ভক্তির গতি প্রকাশ হইয়াছে। জলের স্বাভাবিক গতি নিম্নে কিন্তু অগ্নির স্বাভাবিক গতি ঊর্দ্ধে; অগ্নিরাশি যেরূপ সদতই ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় কথনই নিম্নে যাইতে জানে না এবং যে রূপ অগ্নির উষ্ণত্ব ও ঊর্দ্ধগতি হ্রাস করিবার জন্য জলের আবশ্যক হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর জ্ঞান গর্ব্ব ও উদ্ধত্ব ভাব ভক্তিরূপ অমৃত ধারা ভিন্ন দূর হয় না। বৎস! জ্ঞান শুষ্ক পদার্থ, এজন্য ইহার ভিত্তি জমির উপর কিন্তু ভক্তিরসযুক্ত এজন্য ইহার ভিত্তি জলের উপর। ভক্তি না থাকিলে সাধনাদি সকলই নীরস বোধ হয়। যেরূপ রসগোল্লা কেবল ঘৃতে ভাজিলে ভাল লাগে না, এবং যেরূপ রসে ডুবাইলে তাহা অতি সুন্দর ও সুমধুর বোধ হয়, সেইরূপ জ্ঞান সদাকাল নীরস ইহা ভক্তিরূপ রসে ডুবাইলেই সুমধুর হয়।

বৎস! ভক্তি শাস্ত্রে রূপক দ্বারায় এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, জ্ঞান পুরুষ এবং ভক্তি কোমল প্রকৃতি স্ত্রীজাতির ন্যায়। ইহার প্রমাণ

শাস্ত্রে অনেক আছে। ভাগবতের দশমস্কন্ধে অন্নভিক্ষার স্থানে একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে অতিশয় ক্ষুধিত হয়েন; নিকটস্থ কোন গৃহস্থের বাটীতে যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেছে শুনিয়া সহচর গোপবালকদিগকে যজ্ঞভাগ আনিতে আদেশ করেন। বালকবৃন্দ সেই আদেশানুসারে গৃহস্থের বাটীতে গমনকরতঃ পুরুষদিগের নিকট যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করায় তাঁহারা বলিয়াছিলেন ভগবানের ভোগ না হইলে কোন দ্রব্যই দেওয়া যাইবে না। গোপবালকগণ অগত্যা প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট সবিশেষ কহিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন জ্ঞানগর্ব্বিত পুরুষগণ আমার বিষয় কিছুই অবগত নহেন। তোমরা অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের নিকট প্রার্থনা করগে তাঁহারা যজ্ঞভাগ অবশ্যই দিবেন। বালকগণ পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে সেই গৃহস্থের বাটীতে পৌঁছিয়া অন্তঃপুরবাসিনী ললনাদিগের নিকট অন্নভিক্ষা করিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণমাত্রই বিশেষ আনন্দসহকারে রাশি রাশি অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া যথায় শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতেছিলেন তথায় ব্যাকুলভাবে উপস্থিত হওত ভগবানকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। বৎস! সেইজন্য ভক্তি আচার্য্যগণ বলেন যে পুরুষরূপী জ্ঞান কেবল ভগবানের বাহিরের সংবাদ অবগত থাকেন, কিন্তু স্ত্রীরূপী ভক্তি তাঁহার অন্তঃপুরের সংবাদ রাখেন। অর্থাৎ জ্ঞানাভিমানী পুরুষ কেবল বেদের বিধি নিষেধ বাক্যে বিমোহিত হইয়া থাকেন সামান্য পূজা পাঠ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদি করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন এবং জনমমরণরূপ সংসারগতি অতিক্রম করিবার জন্য মুক্তির জন্য লালাইত হয়েন। কিন্তু ভক্ত ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ও আত্ম সমর্পন করিয়া বিঘ্ন বিপদ ভুক্তি মুক্তি তাচ্ছল্য করিয়া, এক ভগবৎ সেবাই জীবনের সারব্রত করেন।

ভক্তমাল গ্রন্থে সেইজন্য বলা হইয়াছে—

ভকতে ভকতি বিনা চতুর্বর্গ ফল।

দৃকপাত না করে যেন প্রণালীর জল॥
প্রত্যক্ষ দেখহ আর শ্রুতিগণ কহে।
হরিভক্ত মুক্তি চতুষ্টয় নাহি চাহে॥
অতএব হেন রসে বঞ্চিত হইয়া।
মুক্তি চাহে ভাবে মাত্র বাঁচে পলাইয়া॥
ভক্তজন বিঘ্নের মস্তকে দিয়া পদ।
প্রেম যে পরম স্বাদ করয় আস্বাদ।

বৎস! জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য সম্বন্ধে "চৈতন্য চরিতামৃত" প্রণেতা ভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় একটি সুন্দর উপমা দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান।"

বস্তুতঃ জ্ঞান দ্বারা মিথ্যা পরিহারকরতঃ সত্য বিষয় বিশেষ রূপে জানিতে পারাযায় কিন্তু ভক্তিতে সেই জ্ঞেয় স্বরূপকে প্রগাঢ় অনুরাগ সহ সেবা করিতে পারা যায়; একটি বিচারের ফল, আর একটি সেই অমৃত ফল ভোগ করা; একটিতে জানা জানি, আর একটিতে মাখা মাখি।

শিষ্য। প্রভো! আমার একটি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। যদি ভক্তের সেবাই প্রধান বৃত্তি হয়, মোক্ষ উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে ভক্তের ত জন্মমরণ হইতে অব্যাহতি নাই?

গুরু। বৎস! এ প্রশ্নটি তোমার ন্যায় সঙ্গত বটে, কারণ এ সন্দেহ সহসা উপস্থিত হয় তাহা দূর করাও উচিত। বৎস! ভক্তের যদি জন্ম মরণ-রূপ গতিই রহিল এবং জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল তাহা হইলে ভক্তির আর প্রাধান্য কিছুই থাকিত না। বৎস! ভগবৎ ভক্তির এমনি গুণআছে যে লিঙ্গাদি শরীর আপনা আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। যেরূপ জঠরানলে ভুক্ত অন্নাদি পরিপাক হয় সেইরূপ ভক্তি দ্বারায় লিঙ্গাদি শরীর নষ্ট হয়। বৎস! একথার প্রমাণ ভাগবতে ভগবান কপিল দেবের উক্তি। কপিল দেব বলি-

য়াছেন "জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা" (ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ ৩শে শ্লোক দেখ) অর্থাৎ ভক্তির এমনি গুণ যে লিঙ্গাদি শরীরকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। শ্রীধরস্বামী মহাশয় উক্ত শ্লোকের টীকাতে লিখিয়াছেন—

"যা ভক্তি কোশং লিঙ্গ শরীরং জরয়তি বা ক্ষপয়তি স্ব প্রযত্নং বিনৈব সিদ্ধৌ দৃষ্টন্তঃ নির্গীনং ভুক্তমন্নং অনলো জঠরো যথা জরয়তীতি॥

অর্থাৎ ভুক্তান্নকে জঠরানল যেরূপ জীর্ণ করে সেইরূপ ভক্তি স্বভাবতঃ লিঙ্গ শরীরকে দগ্ধ করিয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! আপনি ভক্তি ও জ্ঞানের পার্থক্যসম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন বটে কিন্তু মোক্ষ বিষয়ে যে পার্থক্যে বলিলেন তাহার মূল কারণ কি ?

গুরু। বৎস! ইহার মূল কারণ নির্দ্দেশ করিলে দেখা যায় একটি কামনা মিশ্রিত আর একটি কাম গন্ধশূন্য। জ্ঞানে যে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রার্থনা করে তাহাতে একটু কামনার গন্ধ থাকে কিন্তু ভক্তের যে, নিত্য সেবাব্রত তাহাতে কোন কামনাই নাই।

শিষ্য। প্রভো! মোক্ষ কামনাকে ত কামনার মধ্যে গণনা করা হয় না, আপনি কি করিয়া বলিতেছেন যে ইহা কামনা বিশিষ্ট ?

গুরু। বৎস! শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে নিজের জন্য যাহা কিছু ইচ্ছা করিবে তাহাই কামনা এ অবস্থায় জ্ঞানীর মোক্ষ কামনাকে বিশুদ্ধ কামনা বলিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ কি ? ভক্তের নিজের সুখের জন্য বা নিজের মুক্তির জন্য কখন চিন্তা নাই, ইহার প্রধান সঙ্কল্প ভগবৎ সেবা। নারদ বলিয়াছেন "ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধ রূপাৎ" অর্থাৎ ভক্তি কামনা নিরোধ স্বরূপা। বৎস! ভক্তিতে কামনা মাত্র নাই বলিয়া ইহা শান্তিস্বরূপা পদ বাচ্য।

———o———

সরস ভক্তি বৈরাগ্য ও নীরস জ্ঞান বৈরাগ্যের পার্থক্য।



ভক্তিভর্বে মরণ জনমভয় হৃদিস্থং স্নেহো ন বন্ধুষু মন্মথজা বিকারঃ।
সংসর্গ দোষ রহিতা বিজনা বনান্তঃ বৈরাগ্য মস্তি কি মত পরমর্থনীয়ম্ ॥

শিষ্য। প্রভো! আপনি বলিয়াছেন যে, সরস ভক্তি বৈরাগ্য ও নীরস জ্ঞান বৈরাগ্যের পার্থক্য সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিবেন অতএব কৃপাপূর্ব্বক সে বিষয় কিছু বলুন ?

গুরু। বৎস! পার্থক্যটী শুনিবার পূর্ব্বে বৈরাগ্য কি এবং ভক্তি বৈরাগ্য ও জ্ঞান বৈরাগ্য কাহাকে বলে এবং উহা সরস ও নিরস কোন অবস্থায় হয় ইহা জানা উচিত, এজন্য আমি তোমাকে অগ্রে সেইগুলি বলিতেছি শ্রবণ কর।

বৎস! বৈরাগ্য শব্দের অর্থ বিষয়ে বিরাগ বা আশক্তি শূন্যতা। "আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত মায়াং কল্পিতো জগৎ" অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ মায়া কল্পিত, অতএব ইহা পরিত্যাগ করত ভগবানের উপর নির্ভর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ইহাই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য সাধারণতঃ দুই প্রকার ; একটী ভক্তি বৈরাগ্য আর একটী জ্ঞান বৈরাগ্য। বৎস! জগৎ মায়াময় মিথ্যা এবং জন্ম মরণ রূপ সংসার গতি অতি কষ্টকর এইরূপ বিচার করিয়া যে বৈরাগ্য উদয় হয় তাহা জ্ঞান বৈরাগ্য। আর ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল, অথবা ভগবৎ সেবায় তন্ময় হইয়া সংসারকে ভুলিলে বা আশক্তি শূন্য হইলে যে বৈরাগ্য ভাব হয় তাহাকে ভক্তি বৈরাগ্য বলে। বৎস! ভক্তি বৈরাগ্য সরস আর জ্ঞান বৈরাগ্য নীরস কি জন্য তাহা বলিতেছি শুন।

পূর্ব্বে যে শান্ত দাস্য ও সখ্য প্রভৃতি পঞ্চরসের কথা বলিয়াছি তাহাই ভক্তি বৈরাগ্যের অবলম্বন। সংসারের প্রভু, সংসারের সখা ও বন্ধুজন, সংসারের পুত্র কন্যা এবং সংসারের স্বামী অপেক্ষাও যখন ভগবানকে প্রভু, সখা, পুত্র বা স্বামী ভাবিয়া অধিকতর আনন্দ লাভ

হইবে; প্রেমে আবদ্ধ হইবে এবং যখন সেই আনন্দে মাতিয়া ও প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া সংসারিক সম্বন্ধাদি ভুলিয়া যাইবে তখনই বৈরাগ্য সরস বলিতে হইবে। সে অবস্থায় সাধক সংসারেই থাকুন আর নির্জ্জনেই থাকুন, তিনি নিসঙ্গ, নির্লিপ্ত এবং নির্ম্মম। সে অবস্থায় সাধক নিজকৃত লৌকিক ও পারমার্থিক সমস্ত কর্ম্মই ভগবানকে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন; সে অবস্থায় সাধক প্রাতঃকাল হইতে সায়হ্ন পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু করেন তাহা সকলি ভগবৎ পূজা জ্ঞান করেন। সে অবস্থায় সাধক বলেন :—

" প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং ॥

সে অবস্থায় সাধক ভগবানের সহিত এতদূর প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হয়েন যে, তিনি অনায়াসে হনুমানের ন্যায় প্রভুর নামনা দেখিয়া (দাস্য ভাবে) মহামুল্য• মুক্তাহার দূরে নিক্ষেপ করিবেন, না হয়ত সুদামার ন্যায় (সখ্যভাবে) অতি দীন দুঃখী হইয়া কালাতিপাত করিলেও কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না; আর না হয়ত, দেবকীর ন্যায় (বাতসল্যভাবে) বক্ষে প্রস্তর লইয়া কারাগৃহে দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিয়াও কৃতার্থ বোধ করিবেন; না হয়ত গোপীকা শ্রেষ্ট শ্রীরাধার ন্যায় (মধুর রসে) কলঙ্কিণী হইয়াও সতিত্বের চরম আদর্শ দেখাইবেন।

বৎস! এখন উভয়ের পার্থক্য কি তাহা শ্রবণ কর। পুর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে ভক্তির প্রধান লক্ষ ভবগৎ সেবা, আর জ্ঞানের লক্ষ মোক্ষ লাভ করা, অতএব এ উভয়ের বৈরাগ্যও ঠিক ঐ দুইটি লক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। ভক্তিতে ভগবৎ সেবার জন্য ব্যাকুল করিয়া সংসার ভুলাইয়া দেয়, আর জ্ঞানে মায়াময় সংসার পরিহারকরত নির্জ্জন অরণ্যে বা গিরিগুহায় স্থায়ী করায়। একটিতে নিজের সংসার, নিজের পরিবার, এ ভাব দূর করিয়া নিজের স্থানে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করায় স্ত্রীপুত্রাদিকে ভগবৎ সেবার সহকারী বুঝায়, গৃহ অট্টালিকা ভগবৎ মন্দির ও যাবতীয় লৌকিক ও পারমার্থিক কার্য্যাদি ভগবৎ পূজা

বোধ করায় ; আর একটিতে সংসার মায়ার আকর্ষ্য স্ত্রীপুত্র পরিবারাদি মায়ার বন্ধন এবং ভোগৈশ্চর্য্যাদি সুখের আস্পদ বিবেচনা করায়; একটিতে মায়া বিচার দ্বারায় আশক্তি ত্যাগ করায় আর একটিতে ভগবৎ সেবায় আশক্তি বৃদ্ধি করায়।

বৎস! জ্ঞানি বৈরাগ্যের মূল কারণ সংসার মায়া ময় এইরূপ জ্ঞান হওয়া, কিন্তু ভক্তি বৈরাগ্য ভগবৎ সেবার পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে উদয় হয়।

শিষ্য। প্রভো! জ্ঞানীর বৈরাগ্য উৎপত্তির কারণ শাস্ত্রে কিরূপ বর্ণিত আছে তাহা বলুন?

গুরু। বৎস! বেদান্ত প্রভৃতি জ্ঞান শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে জীব আর ব্রহ্ম এক, কিন্তু একটি মায়ার আবরণ থাকায় পার্থক্য হইয়াছে, সেই আবরণটি দূর হইলেই জীব নাম যাইয়া পরমাত্মা বা ব্রহ্ম উপাধি হয়। তন্ত্রে এই কথার প্রমাণ দেখা যায়, যথা—

তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষা ভবেৎ তণ্ডুলঃ।
মায়া বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ মায়া মুক্তো সদাশিবঃ।

অর্থাৎ যেরূপ তুষে আবদ্ধ থাকিলেই ধান্য বলিয়া অভিহিত হয়, আবার তুষ না থাকিলে তণ্ডুল বলা যায়, সেইরূপ মায়া পাসে আবদ্ধ থাকায় জীব উপাধি প্রাপ্ত হয় কিন্তু মায়া না থাকিলে জীবাত্মাকে পরমাত্মা বলা হয়। বৎস! এই মায়াপাস দূর করিবার জন্যই শাস্ত্রে নানাপ্রকার বিচার উপাস্থত হইয়াছে এই জন্যই বেদেতে মহা বাক্যের উপদেশ, এই জন্যই পঞ্চদশীতে পঞ্চকোসের ভেদ বিচার, তন্ত্রে ষড়চক্র ভেদ, এইজন্যই বেদান্তশাস্ত্রে রজ্জতে সর্প ভ্রমের বিচার এবং এই জন্যই পাতঞ্জলী প্রভৃতি যোগ শাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধণের উপদেশ আছে। ফলতঃ সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য এই মায়া পাস বা ভ্রম দূর করান।

বৎস! সাধক যখন উপরোক্ত শাস্ত্রপাঠেই হউক বা সৎগুরুর উপদেশেই হউক জগৎ মায়াময় ইহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন তখন সত্য বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য তিনি অধীর হয়েন। সে অবস্থায় তাঁহার সংসারকে বিরক্তিজনক বোধ হয় বলিয়াই তাঁহার সংসারে বৈরাগ্য উৎপত্তি হয়।

শিষ্য। প্রভো! জ্ঞানবৈরাগ্যের বিষয় যাহা বলিলেন তাহা বুঝিলাম কিন্তু ভক্তিবৈরাগ্যটি ঠিক কিরূপ তাহা এখনও ভাল বুঝিতে পারি নাই। বৎস! ভক্তি বৈরাগ্য কি প্রকার বলিতেছি। ভক্তিতে বলে যে ভগবানকে ছাড়িয়া যে সংসার তাহাই সংসার পদবাচ্য হয় নতুবা সংসারের কার্য্য ভগবানকে লক্ষ করিয়া করিলে বন্ধন বা মায়ার কারণ হয় না। ভক্তের জন্য শ্রবণকীর্ত্তন প্রভৃতি যে নববিধা ভক্তির অঙ্গ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহা সংসারেই ভালরূপে সাধন হয়। বৎস! আমি পূর্ব্বেই তোমায় আভাষ দিয়াছি যে ভক্ত একনিষ্ট হইয়া ভগবৎ সেবা করেন বলিয়া তাঁহার মনপ্রাণ হরিপদে সমাধি থাকে এবং সে অবস্থায় তিনি ভগবৎ সেবারজন্য সকলি সহ্য করিতে পারেন। সংক্ষেপতঃ ভক্তের সংসারে ঔদাসীন্য ভাব জ্ঞানীর ন্যায় মায়া বিচার ও বন্ধন বোধে উপস্থিত হয় না। তাঁহার ভগবৎ চরণে প্রগাঢ় ভাব থাকায় সংসারে ঔদাসীন্যতারূপ নিরোধ শক্তি উপস্থিত হয়। সেই নিরোধ শক্তির বলে তিনি সংসারে সমস্ত কার্য্য সম্যকরূপে সম্পন্ন করিলেও আসক্তি শূন্য, স্ত্রীপুত্রের সহিত থাকিলেও তিনি মমতাশূন্য, তিনি নিরোধ শক্তি বলে সংসারে থাকিয়াও সংসার বৈরাগী। দেবর্ষি নারদ সেইজন্য বলেন "ওঁ তস্মিং অনন্যতা তদ্বিরোধিষুদাসীনতাচ" অর্থাৎ ভগবানে অনন্য ভাব হইলেই তদ্বিরোধী বিষয়ে স্বভাবতঃ ঔদাসীন্য ভাব হয়। বৎস! সেই ঔদাসীন্যভাবকেই ভক্তি বৈরাগ্য বলে।

ভক্তের বোঝা ভগবানে বয়।

অনন্যা শ্চিন্তযন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥

শিষ্য। প্রভো! আপনার মুখে অমৃতময় ভক্তিতত্ত্ব শুনিয়া আমি চরিতার্থ হইলাম কিন্তু আপনি ভক্তি মহিমা বলিবার সময় বলিয়াছেন যে "ভগবান ভক্তের বোঝা বহন করেন" এ কথায় বড় আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে, বস্তুতই কি ভগবান নিজে ভক্তের বোঝা বহন করেন, না এটি শাস্ত্রকারদিগের রচনা?

গুরু। বৎস! শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা কিছুই রচনা নহে, অনন্ত সত্য তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আমি এ সম্বন্ধে একটী ভক্তের চরিত্র বলিতেছি।

চরিত্র শ্রীঅর্জ্জুন মিশ্র।

অর্জ্জুন মিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ নীলাচলে বাস করিতেন। তিনি পার্থিব ধন সম্পত্তি না থাকায় অতি দরিদ্র ছিলেন বটে কিন্তু পরম সম্পদ লাভে বঞ্চিত ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রকৃতি অতি নির্ম্মৎসরতা শূন্য এবং অতি প্রশান্ত ছিল। তিনি নানাশাস্ত্র বিশারদ একজন সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পবিত্র প্রকৃতিতে পাণ্ডিত্যের অভিমান কখন স্থান পায় নাই। একদিন গীতার নবমাধ্যায়ের টীকা করিতে করিতে পণ্ডিত অর্জ্জুন মিশ্রের মনে এক মহা সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি দেখিলেন ভগবান নিজে বলিয়াছেন "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে, তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" অর্থাৎ অনন্য চিন্তা যুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করিলে আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্তের যোগ আর ক্ষেম বহন করি। মিশ্রের মনে এই সন্দেহ হইল যে, যিনি বৈকুণ্ঠনাথ স্বর্গের দেবতা পরমেশ্বর তিনি কি সত্য সত্যই "যোগ আর ক্ষেম বহন করেন"! এইরূপ সন্দেহ হওয়াতে তিনি স্পষ্ট করিয়া ঐ কথাটী টীকায় লিখিতে পারিলেন না, বরং পাঠের যেস্থানে "বহাম্যহং" বাক্যটী ছিল তাহা লৌহ সলাকার দ্বারায় কর্ত্তন করিয়া দিলেন। ভক্তি সূত্রের প্রধান শ্লোকের উপর পণ্ডিতের এইরূপ সংশয় হওয়াতে ভক্তবৎসল ভগবান, যিনি ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য নানাবিধ লীলা করিয়া থাকেন, অতিশয় ব্যথিত হইলেন। পণ্ডিত অক্ষরের উপর যত আঘাত করিয়াছিলেন সেগুলি সমস্তই ভক্তবৎসল হরির প্রাণে গিয়া লাগিল, কিন্তু তিনি ভক্তের সন্দেহ দূর করিবার জন্য অধিক বিলম্ব করিলেন না। সেই দিবস বারিবর্ষণ হেতু মিশ্র ভিক্ষার্থ বহির্গত হইতে পারেন নাই

সুতরাং অনাহারেই তাঁহার দিবারাত্র অতিবাহিত হয়। পর দিবস মিশ্র ভিক্ষার্থে গমন করিলে দুইজন ব্রাহ্মণ কুমার কিশোর বয়স, স্কন্ধে প্রসাদের ভার লইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং মিশ্র পত্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন মাতঃ! এই প্রসাদ গ্রহণ করুণ। মিশ্রপত্নী প্রসাদ গ্রহণ করিবেন কি বালকদ্বয়ের অলৌকিক রূপ লাবণ্য এবং কোমল অঙ্গে অনবরত রুধির ধারা বিনির্গত দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছাদ্বয়! তোমাদের শ্রীঅঙ্গে কে এরূপ নিদারুণ আঘাত করিয়াছে? তোমাদের যন্ত্রণা দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। বালকদ্বয় কহিল মাতঃ! মিশ্র মহাশয় আমাদের এইরূপ নিদারুণ আঘাত করিয়াছেন। মিশ্র পত্নী শুনিয়া অবাক্—ভাবিলেন যিনি কখন কাহাকে একটী কঠিন কথাও প্রয়োগ করেন নাই তিনি এত নির্দ্দয় কেন হইলেন। মিশ্র পত্নীকে সন্দিহান দেখিয়া বালকদ্বয় পুনরায় বলিল মাতঃ! সত্য সত্যই মিশ্র মহাশয়ই আমাদের এরূপ কঠিন আঘাত করিয়াছেন। মিশ্র পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন কি প্রকারে তিনি আঘাত করিয়াছেন? বালকদ্বয় বলিল—"লৌহশলাকা দ্বারায় আঘাত করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া মিশ্র পত্নী মুর্চ্ছিতাবস্থায় ভুতলে পতিত হইলেন। ইত্যবসারে বালকদ্বয় প্রসাদের ভার তথায় রাখিয়া প্রস্থান করিল। ক্ষণবিলম্বে মিশ্র গৃহে প্রত্যাগমন করত পত্নীকে নিতান্ত শোকাতুরা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, একি! তোমার এরূপ দুর্দ্দশা কেন! গৃহিণী তখন সক্রোধে বলিলেন—হায়, হায়! তুমি এত নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হইয়াছ! তোমার দয়ার লেশমাত্র নাই! ব্রাহ্মণ গৃহিণীর ভাবভঙ্গি ও কথা বার্ত্তা শুনিয়া অবাক, ভাবিল গৃহিণীর বুঝি কোন পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। বার বার পীড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে গৃহিণী সে কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া বলিলেন — এই কি তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম—এতদিন শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া শেষে কি তোমার এই ফল হইল? মিশ্র বলিল কোন বালকের কথা তুমি বলিতেছ আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন মিশ্র

পত্নী বলিলেন—যে বালক দুইটী অদ্য প্রসাদের ভার আনিয়াছিল। মিশ্র বলিল কে ? কি প্রকারে মারিয়াছে। গৃহিণী বলিল তুমিইত লৌহশলাকা দ্বারা তাহাদের সমস্ত অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছ। আহা ! সে রুধিরধারা দেখিলে পাষাণ বিগলিত হয় !

চিন্তাশীল ধীরপ্রকৃতি মিশ্রের তখন হঠাৎ চৈতন্যোদয় হইল, তিনি ভাবিলেন এ সকল ভগবৎ লীলা। তখন উচ্চৈস্বরে ক্রন্দনকরত বলিলেন হায় ! হায় ! আমি বুঝিয়াছি—হায় ! হায় ! আমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছি,—আমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি। গীতার শ্লোকে 'বহাম্যহং' বাক্যটী কর্ত্তন করিয়া আমি ভক্তবৎসল ভগবানের শ্রীঅঙ্গে রুধিরাক্ত করিয়াছি হায় ! হায় ! ভক্তিকে অবজ্ঞা করাতে আমার নরকেও স্থান হইবে না, যেহেতু আমি ভগবানের অপ্রিয় হইলাম। হায় ! হায় ! আমি 'বহাম্যহং' বাক্যটী কর্ত্তন করাতে ভগবান নিজেই প্রসাদের ভার বহন করিয়া দেখাইলেন যে সত্য সত্যই তিনি " যোগ আর ক্ষেম নিজে বহন করেন "। মিশ্র তখন পত্নীর ভাগ্যের বিষয় ভাবিয়া বলিলেন—আহা ! গৃহিণী তুমিই ধন্যা, তুমি পুণ্যবতী, যে আজ ভক্তবৎসল ভগবানকে স্বচক্ষে দর্শন করিলে। আহা ! তাঁহাকে দর্শন করিলে ভববন্ধন দূর হয়। আমি হতভাগ্য তাই তাঁহার দর্শন পাইলাম না। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী উভয়ে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। পরে মিশ্র যে টীকার স্থানে 'বহাম্যহং' বাক্যটি কর্ত্তন করিয়াছিলেন সেই স্থানে তিন বার লিখিলেন " বহাম্যহং " " বহাম্যহং " " বহাম্যহং "। অদ্যাবধি মিশ্র প্রণীত সেই গীতার টীকা দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অতি আদরের ধন।

অতএব বৎস ! তোমাকে ভক্তি সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য জানিবে প্রমাণ অনেক আছে সকল বলিবার আবশ্যক নাই। ভগবান ভক্তিতে চিরদিন আবদ্ধ, ভক্তিতেই কেবল তাঁহাকে জানা যায় এই ভক্তিতেই তিনি অকিঞ্চন দীন হীন ভক্তের বোঝা বহন করেন এবং এই ভক্তিতেই আবদ্ধ হইয়া তিনি অতি নীচ জাতিরও সমাদর করেন।

যথা—চণ্ডালোপি মুনিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোপি স্বপচাধমঃ।

বৎস! দাক্ষিণাত্য প্রদেশস্থ পঞ্চবটীর বনে একটী চণ্ডালের কন্যা থাকিত, তাহার নাম শবরী। একদিন প্রত্যুষে পঞ্চবটীস্থ ঋষিগণ নদীতে স্নান করিতেছিলেন এমন সময় শবরী ঘাটের এক প্রান্তে স্নানার্থে নামিয়াছিল। শবরীকে দেখিবামাত্র ঋষিগণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা, সকলেই আরক্ত লোচনে অতি কটু বাক্যে তিরস্কার করতঃ শবরীকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। নিঃসহায় শবরী এইরূপ ঋষিগণ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া যাই ক্রন্দন করিতে করিতে নদী হইতে উঠিলেন অমনি নদীর জল রক্তবর্ণ ও কৃমি কীটে পূর্ণ হইয়া এক বিভৎসরূপ ধারণ করিল। নদী জলের সেই ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া ঋষিগণ সভয়ে প্রস্থান করিলেন। শবরীও দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া নদীতটে একটী সামান্য কুটীরে বাস করত কোনরূপে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

কিছু দিবস এইরূপে অতিবাহিত হইলে শবরীর ভাগ্যচক্র ফিরিল। ভগবান রামচন্দ্র পঞ্চবটীর বনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পর্ণ কুটীরে অতিথী হইলেন। রামচন্দ্রের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পঞ্চবটীস্থিত ঋষিগণ দর্শনার্থে আগমন করিয়া বলিলেন প্রভো! অকস্মাৎ নদীর জল কৃমী কীটে পূর্ণ হওয়ায় আমাদের বৈদিক ক্রিয়াদি বন্ধ হইয়াছে। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার কারণ কি? ঋষিগণ বলিলেন প্রভো! আমরা ইহার কারণ কিছুই অবগত নহি। ভগবান রামচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন জ্ঞানাভিমানী ঋষিগণ আমার ভক্তিরাজ্যের গূঢ়তত্ত্ব কিছুই অবগত নহেন। ঋষিদিগকে তিনি বলিলেন—হে বিপ্রগণ! তোমরা আমার প্রাণের ভক্ত শবরীকে একদিন নদী হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিলে সেইজন্য জল এরূপ হইয়াছে। যদি এ জল পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে চাহ তাহা হইলে সত্বরে এই শবরীকে নদী জলে নামাও ইহার পদস্পর্শে জল পূর্ব্বের ন্যায় হইবে। ঋষিগণ ভগবান রামচন্দ্রের আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ শবরীকে নদীজলে নামাইলেন। আহা! ধন্য ভগবানের ভক্তবৎসলতা। ভক্ত শবরী নদীজলে নামিবামাত্র জল পূর্ব্বের ন্যায় হইল।

কালভকত চরিত্র।



শ্রীবৃন্দাবনের অন্তর্গত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটস্থ কোন হাড়ির কুলে কালভকত জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি নাথজির একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। নীচ জাতি প্রভুর কোন কাজেই অধিকার নাই বলিয়া তিনি ক্রমাগত নাথজির শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিক ঝাড়ু দিয়া জল ছিটাইতেন, আর মন্দিরের একটী ঝরকা দিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করতঃ অপার আনন্দানুভব করিতেন। এইরূপ প্রত্যহ কালভকত ঝরকার ফাঁক দিয়া চরণ দর্শন করিতেন বলিয়া মন্দিরের গোঁসাই ও পুরোহিত মহা দুঃখিত হইলেন। একজন হাড়ি ঝরকা দিয়া পূজা পাঠ শুনে ও ভোগের দ্রব্যাদি দেখে এজন্য তাঁহারা ক্রোধে ঝরকার ফাঁকটী বন্ধ করিয়া দিলেন। পরদিন হাড়ি সসব্যাস্ত হইয়া ঝরকার নিকট গিয়া যখন দেখিল যে ঝরকা বন্ধ, তখন তাহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল। সে তখন দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রভুর চরণ দর্শন না করিয়া কিরূপে সে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে, কি করিয়া জল গ্রহণ করিবে, এই ভাবিয়া সে অস্থির। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ঝরকার নিকট অপেক্ষা করিয়া রহিল, চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখিল যদি কোন উপায়ে একবার প্রভুর চরণ দর্শন হয়, কিন্তু হাড়ির মন্দ ভাগ্যে সেদিন আর সে আশা সফল হইল না। নীচজাতি ভিতরে যাইবার উপায় নাই সেজন্য কালভকতের মন আর মন্দিরের নিকট হইতে সহজে প্রত্যাগমন করিতে চাহে না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। আহা! ভগবানের চরণ দর্শন করিতে না পাইয়া ভক্তকালভকত যে এত দুঃখে ক্রন্দন করিল তাহা জগতের কেহই শুনিল না বরং আত্মাভিমানীজ্ঞানান্ধ ও জাত্যাভিমানী পুজারি ব্রাহ্মণগণ আরও অধিক আনন্দিত হইলেন যে আজ হাড়ি বেটা ভোগের দ্রব্যাদি দেখিতে পায় নাই, আজ ঠাকুরের নৈবেদ্যের কোন বিঘ্ন হয় নাই। অস্পৃশ্য

হাড়ির ক্রন্দন কেহই শুনিল না। কিন্তু সেই দীন দুঃখীর এক মাত্র বন্ধু, কাঙ্গালের এক মাত্র অবলম্বন, অধম ও পতিত জনের এক মাত্র পরিত্রাতার কর্ণে সেই অস্পৃশ্য হাড়ির ক্রন্দন প্রতিধ্বনিত হইল। তিনিই কেবল সেই হাড়ির দুঃখের আবেদন ও মর্ম্ম বেদনার কথা শ্রবণ করিয়া অস্থির হইলেন। নাথজী ভক্তের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ স্বপ্নযোগে গোঁসাইকে বলিলেন যে অদ্য ঝরকা বন্ধ করিয়া আমাকে অতিশয় কষ্ট দিয়াছ। আজ আমার পরমভক্ত কালভকত আমার দর্শন না পাওয়াতে আমার নিতান্ত দুঃখ হইয়াছে, আমি ভক্তকে দেখিলে সন্তুষ্ট হই, অতএব শীঘ্র শীঘ্র ঝরকা খুলিয়া দেও, উহা যেরূপ ছিল সেইরূপ থাকিবে। মহন্ত স্বপ্ন-যোগে ভগবানের আদেশবাণী শুনিয়া অস্থির। অতি প্রত্যূষে ঝরকা খুলিয়া দিলেন এবং ব্যাকুলভাবে হাড়ির বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক আহ্বান করতঃ মন্দিরে আনিলেন এবং অতি যত্নসহকারে ঠাকুর দর্শন করাইলেন। আহা! ভক্তকালভকত তখন প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া আনন্দের আর সীমা রহিল না, এবং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানও ভক্তকে দর্শন দিয়া অপার আনন্দসাগরে ভাসিলেন।

অতএব বৎস! দেখ ভক্ত অতি নীচ ঘৃণিত জাতি হইলেও ভগবান সমাদর করিয়া থাকেন কি না? বৎস! ভগবৎলীলা অতি গূঢ়, অভক্ত লোক তাহা সহজে বুঝিতে পারে না, নতুবা নৃসিংহরূপী ভগবান ভক্ত প্রহ্লাদকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া অভয় দান দিলেও দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপু কিছুই বুঝিতে পারে নাই কেন? জগৎমাতা আদ্যাশক্তি ভগবতী প্রাণের শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে করিয়া বধ্য ভূমিতে বসিলেও সিংহলেশ্বর কিছুই বুঝিতে পারেন নাই কেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথী হইয়া কালদৃষ্টিতে সমস্ত কুরুসৈন্য ধ্বংশ করিলেও দাম্ভীক দুর্য্যোধন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই কেন? এবং ভগবান রামচন্দ্র বিনীত ভক্তবিভীষণকে চরণে স্থান দিয়া সোণার লঙ্কা ছারখার করিলেও লঙ্কেশ্বর রামচন্দ্রের মহিমা সহজে বুঝিতে পারেন নাই কেন?

বৎস! অভক্তই ইহার মূল কারণ জানিবে। যাঁর অভক্ত তাহার দিব্য দর্শন নাই, সেই জন্য ভক্তি আচার্য্যগণ ভক্তিপথ অনুসরণ করিতে বারম্বার বলিয়াছেন। বৎস! যে সকল ভক্তের চরিত্র তোমাকে আমি বলিলাম তাঁহাদিগের একমাত্র ভূষণ ছিল দীনতা, সেই দীনতার গুণে তাঁহারা জগৎকে বশীভূত ও ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন। অতএব বৎস! তুমি এই দুর্লভ ভক্তিধন লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা দীনভাবাপন্ন হইবে।

তৃণাদপি সুনীচেনঃ তরোরিব সহিষ্ণুনাঃ।
অমানিনঃ মানদেয়ঃ কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥

সম্পূর্ণ।

———o———